চিন্তাধারা সিরিজ

০১

পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার নীতি

শায়খ কাসিম আর-রিমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ– ১

পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার নীতি

শায়খ কাসিম আর-রিমি (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন[১])

অনুবাদ ও প্রকাশনা



AL HIKMAH MEDIA

[১] এই বয়ান যখন প্রকাশিত হয়, শাইখ রহিমাহুল্লাহ তখন জীবিত ছিলেন, তাই দুয়া এভাবে লেখা হয়েছে।

কিছু গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে কোনো নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করলে কয়েকদিন পরই সেখানকার লোকেরা খুব দুর্বল প্রকৃতির কিছু বিচ্ছু ধরে নিয়ে আসে আর সেগুলো সেই ছোট্ট শিশুটিকে কামড়াবার জন্য ছেড়ে দেয়। কয়েকবছর পর তারা শিশুটির জন্য আরও বিষাক্ত বিচ্ছু নিয়ে আসে এভাবে শিশুটি ৭ বছরের চেয়ে সামান্য বড় হলে দেখা যায় তারা এমনসব বিচ্ছু নিয়ে আসে যেগুলোর বিষ সাধারণ মানুষের জন্য হয়ত মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু এখন যেকোনো ধরণের পোকামাকড় বা বিষই আসুক না কেনো, সে আর সেগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কেননা তার শরীরে এখন প্রতিষেধক গড়ে উঠেছে আর, তার রক্তে এখন সেই ধরনের শক্তিশালী সিরাম রয়েছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য! এই সকল ঘটনার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যদি আপনি প্রথম স্তর থেকেই একবারে উচ্চ স্তরে লাফিয়ে উঠে যেতে চান, তবে এই লাফে আপনার কোমর ভেঙে যেতে পারে। এবং যদি আল্লাহ আপনাকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র (প্রতিষ্ঠা করা) সহজ করে দেয়, তবে (বুঝতে হবে যে) এর সমস্যাগুলোও হবে একটি রাষ্ট্রের সমান।

আর যেকোনো সমস্যাই আপনাকে শুরুতেই শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু যখন একটি দল পর্যায়ক্রমিক ভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় তখন একটা ছোট সমস্যা সামনে এলেই আপনি তা সমাধান করতে পারবেন। আর আপনার তখন কীভাবে কী করতে হবে সেই জ্ঞান থাকবে, এছাড়াও হতবাক হয়ে পড়বেন না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চিন্তাধারা সিরিজ

০২

জিহাদ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত

শায়খ নাসির আল উহায়শি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ– ২

জিহাদ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত

শহিদ শায়খ নাসির আল উহায়শি রহিমাহুল্লাহ্

প্রাক্তন আমির, আল কায়েদা জাজিরাতুল আরব

অনুবাদ ও প্রকাশনা



আলহামদুলিল্লাহ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। চাই অমুক নিহত হোক বা নিহত হোক কোনো নেতা অথবা কোনো সেনা কমান্ডার!

আমরা নয়/দশ বছর যাবত কতবারই শুনেছি যে আফগানিস্তানে কুফফাররা জনৈক নেতাকে হত্যা করেছে, অমুক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে অথবা, তালেবান কিংবা আল কায়দার সোমালিয়া, ইসলামী মাগরিব শাখার জনৈক ভয়ানক যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে অথচ জিহাদ চলমান আছে, বন্ধ হয়ে যায় নি!

আমেরিকান প্রশাসন কোনো মুজাহিদ নেতা বা কমান্ডারকে হত্যা করে ধারনা করে যে, এখন জিহাদ শেষ হয়ে যাবে অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত।

মূলতঃ এটা মুসলিম উম্মতের উন্নতির সূচনা!! তারা আমেরিকার চাকরদের দ্বারা সৃষ্ট এই সংকট থেকে বের হয়ে আসেন, এবং আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেন। এবং তাঁরা (মুজাহিদরা) পবিত্র ভূমিসমূহকে ফিরিয়ে আনেন যা ক্রুসেডাররা ছিনিয়ে নিয়েছে। এভাবেই একসময় মুসলমানদের হাতে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত হয়ে যায়! আল্লাহর কাছে কামনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর পছন্দনীয় দ্বীনের উপর থাকা সহজ করে দেন, এবং ভয়ের পরে নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন!

চিন্তাধারা সিরিজ

০৩

কখন আমরা শারিয়াহ দ্বারা শাসন করব?

শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ



AL HIKMAH MEDIA

Al-Malahem Media

চিন্তাধারা সিরিজ– ৩

কখন আমরা শারিয়াহ দ্বারা শাসন করব?

শহিদ শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ

প্রাক্তন নায়েবে আমির, আল কায়েদা জাজিরাতুল আরব

অনুবাদ ও প্রকাশনা



এই দুটি বিষয় হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–

বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ইসলামী দলের মাঝে সমস্ত শরয়ী প্রশ্নের সমাধান এটা করে দিবে; তা হচ্ছে–প্রথমে আক্রমণকারী শত্রুকে হটাতে হবে তারপর শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হবে।

অধিকাংশ মানুষই দাবী করে যে, আমরা এখন শরিয়াহর শাসন চাই। সমস্ত দলে একটাই আশা যে, তারা শরিয়াহ দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবে। কিন্তু কীভাবে?

তখন তারা বলেঃ আমরা এমন একটি পর্যায়ে আছি, যে অবস্থানে থেকে এই সমস্ত দেশে শরিয়াহ আইন গণতন্ত্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কেন??? কারণ তাদের দ্বারা আগ্রাসী শত্রুকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এই ধরনের শাসনে (গণতান্ত্রিক শাসন) আগ্রহী হওয়ার দিকে নেমে আসা এবং এই শাসনকেই শরিয়াহর শাসন আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে আমরা শরিয়াতকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নই। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে পারবো

...আর গণতন্ত্র হচ্ছে দ্বীনের বিপরীত।

তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় গণতন্ত্র কী? তারা বলেঃ এটা হচ্ছে শূরা, অধিকাংশ মানুষের রায়ের শূরা আর এ ধরনের কথা ও কাজের পেছনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মরণের ভয়!

এগুলো তাদের মধ্যে দ্বীনের কোনো কিছু থেকে আসেনি। আল্লাহর কসম! দ্বীনের কোনো চাহিদা থেকে নয়। বরং সবই এসেছে নিজেদের বিভিন্ন দিকের দুর্বলতা থেকে। তাই হে প্রিয় সাথীরা! প্রত্যেক তানজীম ও জামাতের প্রথম লক্ষ্য হবে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা এটাই শরীয়তের হুকুম। এবং এটা উম্মতে মুসলিমার প্রত্যেকের উপর ফরজ! যখন আক্রমনকারী শত্রু ইসলামের ভূমিতে প্রবেশ করবে তখন সবার উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যায়। যাতে শত্রু বের হয়ে যায়! এবং এটা সমস্ত ইবাদতের উপর মুকাদ্দাম বা অগ্রগামী (শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার উপরও)

মূল বিষয়টা হচ্ছে অন্যায় ভাবে আক্রমণ। অর্থাৎ যখন মুসলমানদের ভূমিতে আক্রমণ করা হবে, তখন সর্বপ্রথম আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে বের করে দেয়া। তারপর আমরা শরিয়াহ কায়েম করব। কারণ শরিয়াহ কখনোই শত্রু মুসলমানদের ভূমিতে থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। কখনই না!

সুতরাং বর্তমান তানজিম ও জামাতসমূহের বিষয়টা হচ্ছে, তারা যুদ্ধ করছে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য। সর্বপ্রথম লক্ষ্য আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা। আর, তা হচ্ছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা (মুরতাদ শাসকেরা)

এখন আক্রমণকারী শত্রু দুই ধরনের,

একটা হচ্ছে বাইরের,

আরেকটা হচ্ছে ভেতরের।

বাইরের আক্রমণকারী শত্রু হচ্ছে যারা বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করে, যেমন- আমেরিকা ও ক্রুসেডাররা! আর ভেতরের আক্রমণকারী শত্রু হচ্ছে মুরতাদ শাসকরা, এখানে (ইয়েমেনে এবং বাংলাদেশেও) শত্রু হচ্ছে মুরতাদরা। সুতরাং এই সমস্ত শাসকদেরকে প্রতিহত করা, সরিয়ে ফেলা এবং বের করে দেওয়া ওয়াজিব, যতক্ষণ না নিঃশেষ হয়ে যায়। কেন? যাতে আমরা আল্লাহর শরিয়াহকে বাস্তবায়ন করতে পারি। আমরা কখনোই আল্লাহর শরিয়াহকে জমিনে বাস্তবায়ন করতে পারবো না, যতক্ষণ সেখানে দখলদাররা থাকবে! এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ভাল করে মনে রাখতে হবে! আমরা ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর শরিয়াহ কায়েম করতে পারবোনা, যতক্ষণ না মুসলমানদের ভূমি থেকে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা হয়!

চিন্তাধারা সিরিজ

০৪

শাহাদাতের সংস্কৃতি

শহিদ শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ– ৪

শাহাদাতের সংস্কৃতি

শহিদ শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



জাজীরাতুল আরবের শাহাদাত বৃক্ষে অনেক ফল ধরেছে। আর ফল কাটার সময়ও হয়েছে। তাই আল্লাহ ﷻ এদের থেকে অনেককে শহীদরূপে গ্রহণ করলেন। এইসকল শাইখদের মাঝে রয়েছেন আবদুল্লাহ আল মিহযাব রহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ ওমায়র রহিমাহুল্লাহ, শ্রদ্ধেয় ভাই আবু সালেহ ও আরো শহীদগণ।

আল্লাহ ﷻ এদেরকে শহীদরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মানুষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না, বরং এই দৃষ্টিতে দেখে যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ জানে না যে, তাঁরাই (শহিদেরাই) এই ব্যবসায় লাভবান হয়েছে! কেননা আল্লাহর সাথে ব্যবসায়, আল্লাহ যখন কাউকে শহীদরূপে গ্রহণ করেন, এটা তো উক্ত ব্যক্তির জন্য মর্যাদা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ! ধ্বংস নয়। এটা কখনোই ধ্বংস নয়! একারণেই মানুষের উচিত শাহাদাত কামনার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা!

একথা বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দান; এটা ধ্বংস বা ক্ষতি নয়।

গোত্রের লোকেরা যেনো কিছুতেই মনে না করে যে, এসকল লোক, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বরং তারা লাভবান হয়েছে এবং তাদের মর্যাদা লাভ হয়েছে। যে সকল ইস্তেশহাদীদেরকে তারা পেশ করেছে, তারা ঐ সকল পিলারসমূহের দ্বারা গৌরবান্বিত হবে। প্রত্যেক গোত্র এটা নিয়ে গর্ব করবে। অমুক এত শহীদ পেশ করেছে, অমুক গোত্র এত শহীদ পেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুসলিমগণ এ নিয়ে গর্ব করতো যে, তাঁরা কত বেশি ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করতে পারে! তারা দুনিয়াবী বিষয়বলী নিয়ে গর্ব ও বড়াই করত না। প্রতিযোগীতা দুনিয়াবী বিষয়াদীতে হবে না। প্রতিযোগিতা হবে পরকালীন বিষয়ে।

“এ বিষয়েই যেন প্রতিযোগীতাকারীরা প্রতিযোগীতা করে।” (সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত: ২৬)

পরকালীন বিষয়ে। দুনিয়াবী বিষয়ে নয়। আল্লাহ ﷻ এই ভূমিতে মুজাহিদদেরকে সম্মানিত করেছেন, ফলে তাঁদের মধ্য থেকে এই সকল লোকদেরকে শহীদ হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদেরকে মনোনীত করেছেন, যেন তারা ক্রুসেড হামলায় শাহাদাত বরণকারীদের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম হন।

শাহাদাতবরণ তো সর্বকালেই চলমান যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে: এটা এমন ঋতু, যা কখনো শেষ হবে না। কিন্তু এই নতুন হামলা যাতে আমেরিকা সরাসরি নেতৃত্ব দিচ্ছে; এটাই শাহাদাতের প্রথম গুচ্ছ।

চিন্তাধারা সিরিজ

০৫

প্রজ্ঞা

শায়েখ হারিস ইবনে গাজী আন নাযযারী রহিমাহুল্লাহ





AL HIKMAH MEDIA



চিন্তাধারা সিরিজ- ৫

প্রজ্ঞা

শায়েখ হারিস ইবনে গাজী আন নাযযারী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

“যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।” - সূরা হুদ, আয়াত:২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জানালেন যে, এই কিতাব মুহকাম। কুরআন মুহকাম (তথা সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়)। তার মাঝে কোন অসংগতি ও দোষ-ত্রুটি নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো জানালেন যে, এটি বিজ্ঞানময় কুরআন। তার মধ্যে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা রয়েছে। যে প্রজ্ঞা লাভ করতে চায়, সে মহান কুরআন থেকে তা লাভ করবে। প্রজ্ঞাশীল সিদ্ধান্তের একমাত্র উৎস কুরআন।

অন্যকথায়, সিদ্ধান্ত, নীতিমালা ও কথায় যতবেশি কুরআন থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়; তত বেশি তা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও হিকমতপূর্ণ হয়। কেননা এটাই পৃথিবীতে একমাত্র হিকমতের উৎস। যা হচ্ছে ওহী। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কালাম।

অতএব কুরআন থেকে সাহায্য গ্রহণ করার অনুপাতেই হিকমত লাভ হবে। আর কুরআনের বিপরীত করা হবে যতটুকু, ততটুকু নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা আসবে। কুরআন হল বিজ্ঞানময় ও সুদৃঢ়।

চিন্তাধারা সিরিজ

০৬

জিহাদি কাজের নির্দেশনা

শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৬

জিহাদি কাজের নির্দেশনা

শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ্

অনুবাদ ও প্রকাশনা



ইসলামি কাজের ভিত্তি হল–

প্রথমতঃ বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করা।

দ্বিতীয় বিষয় হলঃ শরয়ী ফতওয়া।

ফতওয়া আর শরয়ী হুকুমের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। শরয়ী হুকুম হলো সত্ত্বাগত হুকুমটি। যেমন আল্লাহকে গালি দানকারী বা নামায পরিত্যাগকারীর হুকুম হল তাকে তাকফীর করা। এগুলো হল স্থায়ী হুকুম।

কিন্তু চলমান অবস্থার জন্য ফতওয়া প্রদানের প্রয়োজন হবে, সে জন্য আপনাকে চলমান অবস্থা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, অতঃপর তাকে কুরআন-সুন্নাহর নীতির উপর রাখতে হবে। কেননা কুরআন সুন্নাহর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলঃ তার সমস্ত বিষয়গুলো স্থির ও অবিচল।

তাই যখন আপনি চলমান অবস্থার ব্যাপারে আপনার উপলব্ধিটা কুরআন-সুন্নাহর নীতির উপর রাখবেন তখন আপনার সামনে একটা ফলাফল বেরিয়ে আসবে। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মত পরিস্থিতিতে, যখন সমস্ত সরকারগুলো ধর্মত্যাগী মুরতাদ ও দালাল সরকার জনগণ মুসলিম আর দেশগুলো হক কাফেরদের দখলকৃত ইসলামী দেশ। তাই আপনাকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হবে, অতঃপর তাকে কুরআন-সুন্নাহর নীতির উপর রাখতে হবে। তখনই সামাজিক মুআমালার ক্ষেত্রে আপনার সামনে একটি ফলাফল বের হয়ে আসবে।

সমাজ কি মুসলিম না কাফির? সমাজ কি আদি কাফের না ধর্মত্যাগী কাফের এখানকার রক্ত, সম্পদ ও সম্মান কি ঐ সকল কাফের দেশগুলোর মত বৈধ, যেখানে আদি কাফেরগণ বসবাস করে নাকি বর্তমান দেশগুলোর মিশ্র অবস্থা?

ফলে সরকারের জন্য হবে একটি হুকুম, সরকারের সদস্যদের জন্য হবে একটি হুকুম। সমাজের জন্য হবে একটি হুকুম এবং দেশের জন্য হবে একটি হুকুম? এ বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই এখন কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে

পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এমন ফতওয়া না আসে, যা তার সামনে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরবে।

তাই বিষয়টি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি এসেই সেখানে সামরিক কার্যক্রম চালু করে দিতে চাচ্ছে তাই সে শুধু নিজের অবস্থাটি দেখে এই ভিত্তিতে কাজ শুরু করে দিবে যে, সরকার মুরতাদ, আর একারণে পুরো সমাজ কাফের। না, এমনটা সঠিক নয়।ইস্তেশহাদী হামলা, গাড়ি হামলা না বোমা হামলার ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসলমানদের রক্তের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোনো মিশ্র দেশে বসবাস করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যখন আপনি কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিবেন, তখন আপনার টার্গেটগুলো অবশ্যই অনেক চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন হতে হবে। যাতে আমরা মুসলমানদের আক্রমণ বা ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ রাখতে পারি।

তৃতীয় বিষয়ঃ বাস্তব পদক্ষেপ

যখন আমরা বাস্তব অবস্থাটি সর্বদিক হতে উপলব্ধি করবো এবং শরয়ী মূলনীতিসমূহের আলোকে শরয়ী ফতওয়া গ্রহণ করবো, তখন আমাদের জন্য একটি কার্যকরী ফলাফল বের হয়ে আসবে। চাই তা শরয়ী ফতওয়ার ফলাফল হিসাবে হোক অথবা বাস্তব অবস্থার ফলাফল হিসাবে হোক। যেমন বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে যুদ্ধ, নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি বা এজাতীয় কিছু।

তাই বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হবে শরয়ী ফতওয়ার পরে। শরয়ী ফতওয়া আপনাকে একটি সামগ্রিক কাঠামোতে নিয়ে যাবে আপনাকে বলে দিবে যে, এই দেশটি মিশ্র, তাই এখানে এটা করো না.. তোমার কার্যক্রমগুলো শরয়ী নীতির আলোকে হতে হবে। এমনটা করো না.. এমনটা করো.. এগুলো হারাম রক্ত.. ইত্যাদি। তাই হে ভাই! এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রতিটি ভাইকে এগুলো ভালভাবে বুঝতে হবে। বিশেষ করে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বশীল ভাইদেরকে। কোনো মানুষ মুসলমানদের রক্তের ব্যাপারে উদাসীন হতে পারে না।

এ সকল বিষয়ে উদাসীন হওয়া যাবে না। কারণ এগুলো হল অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় তাই যখন আমরা এই তিনটি বিষয় ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবো, তখন যেকোনো স্থানে কাজ সাজাতে পারবো।

চিন্তাধারা সিরিজ

০৭

জীবিতদের প্রশংসা

শায়খ হারিস আন নাজ্জারি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৭

জীবিতদের প্রশংসা

শায়খ হারিস আন নাজ্জারি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক মহাপুরুষগণ অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের রয়েছে বিরাট কীর্তি। খুলাফায়ে রাশেদীন রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। যেমন ধরুন, আবু বকর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে দ্বীন হেফাজত ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যার রয়েছে স্বীকৃত অবদান। কিন্তু আমরা সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের কাউকে বা কোন কবি সাহাবীকেও এমন পাইনি যিনি আবু বকর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর প্রশংসা করেছেন, যেহেতু তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেউ এমন বলেননি যে- এই হলেন আমাদের মহান নেতা... এই হলেন আমাদের অমুক নেতা... বা তমুক নেতা।

এমনিভাবে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু। যিনি পারস্য বিজয় করেছেন কিন্তু আমরা কোন সাহাবীকে এমন পাইনি, যিনি ওমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু'কে নিয়ে গর্ব করেছেন; এধরণের কথা বলেছেন যে- তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি আমাদের নেতা, ইমাম, তোমরা দেখাও কে তোমাদের নেতা! এমনটি হয়নি। সকলের পরিচয় হত কিতাব-সুন্নাহ দিয়ে।

এমনিভাবে ওসমান রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু। যার শাসনামলে অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে। আলি ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। হাসান রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু। তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর হাতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তারা এই আদবটি শিখেছিলেন যে- জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা হবে, আল্লাহ ও তার নবী ﷺ যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে। নবী ﷺ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আগামীতে আবার খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ আসবে। আমাদেরকে খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ ফিরে পাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা নেককার পূর্বসূরিগণকেই অনুসরণ করবো, যেমন নবী ﷺ ও তার সাহাবীগণ করেছেন। তাই নেতা, সামরিক নেতা হোক বা সামগ্রিক নেতা হোক, তাকে এই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে যে, সে একজন

মানুষ এবং তাদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। চাই তারা যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক নেতা হোক অথবা ইলমী নেতা হোক। কেননা আমরা এমন অনেক সামরিক নেতা ও ইলমী নেতার সম্পর্কে জেনেছি, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দানের পর গোমরাহ করেছিলেন। জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

একারণে ধরুন, আমরা শায়খ ও নেতৃবৃন্দকে ভালবাসি। কিন্তু অধিক প্রশংসা, প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য ফেতনা। যেমন আবু বাসীর বা অন্য কোন ময়দানের নেতার প্রশংসা করা হল। ধরুন আপনিই, আমি যখন আপনার প্রশংসা করবো- আপনি নেতা, আপনি অমুক.. তখন এটা কি আপনার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, না করবে না? অবশ্যই এটা আপনার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তাই আপনিও আপনার ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করবেন। তার অন্তর ও নিয়্যত হেফাজতে তাকে সাহায্য করবেন। তাকে বিকৃতি, বিচ্যুতি, ফেতনা ও বক্রতা থেকে বাঁচাবেন। আপনি তাকে বলবেনঃ তুমিও আমাদের মত একজন মানুষ। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং নবী ﷺ এর সুন্নাহর অনুসরণ করো! হ্যাঁ, আমরা তার সম্পর্কে ভাল অনেক কিছু জানি। তাই আমরা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেই, একে অপরকে সবরের উপদেশ দেই.. কিন্তু প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ভিন্ন জিনিস..।

একারণে দেখুন, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু'কে কখন প্রশংসা করা হয়েছিল, কখন তার গুণকীর্তন করা হয়েছিল? তার সম্পর্কে যত কবিতা, সব রচিত হয়েছে তার মৃত্যুর পরে। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর জীবদ্দশায় আমরা কোনো কবি সাহাবীকে বা কোনো কবি তাবিয়ীকে তার প্রশংসা করতে বা এরূপ বলতে দেখিনি যে- সে এমন সিপাহসালার, যিনি কাফেরদেরকে নত করেছেন। তিনি এমন নেতা.. তাই নেককার পূর্বসূরিরা যা করেছেন, আমরাও তাই করবো।

আমি জানি যে, নেতৃবৃন্দ ও আমিরদের প্রশংসা করা মনের একটি প্রিয় বিষয়। এটা আমার নিকটও আকর্ষণীয়। আমিও এটাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি আমার প্রবৃত্তি ও আবেগ থেকে অধিক ভালবাসি নবী ﷺ এর পথনির্দেশ ও পূর্বসূরিদের আদর্শকে। আর আমি আমার ভাইদের ব্যাপারেও যত্নশীল। একারণেই পূর্বে আল-মালাহিম মিডিয়ায় কিছু কিছু জীবিত লোকদের প্রশংসামূলক সংগীত পাওয়া যেত। তখন

শরয়ী বোর্ড সংগীতের জন্য যেসকল শর্ত আরোপ করে, তার মধ্যে এটাও ছিল যে, তাতে জীবিত লোকদের প্রশংসা থাকতে পারবে না। এবং কোন শহীদের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি হওয়ার কথা বলা যাবে না। যেমন অমুকে নিহত হয়েছে, এখন সে জান্নাতে আছে, সে এখন এই এই অবস্থায় আছে...। বরং এরূপ বলতে হবে যে, আমরা তার ব্যাপারে এমনটা আশা করি। কিতাব-সুন্নাহ যার ব্যাপারে অকাট্যভাবে কিছু বলেনি, আমরা তার ব্যাপারে অকাট্যভাবে কিছু বলি না। কিন্তু নিহতদের ব্যাপারে আমরা আশা রাখি যে, তারা শহীদ হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর নিকট জান্নাতে আছেন। আর জীবিতদের ব্যাপারে চাই সে নেতা হোক বা অন্য কেউ হোক- আমরা আশা রাখি যে, তারা কল্যাণপ্রাপ্ত ও সৎ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। এবং আমরা আশা রাখি, আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে উত্তম পরিসমাপ্তি দান করবেন। কারণ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেনঃ "জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনা আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।" স্বাভাবিকভাবেই আমি এখন নির্দিষ্ট কোন গায়ক বা নির্দিষ্ট কোন ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলছি না। বরং আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি মাত্র।

যার মূলকথা হচ্ছেঃ নেতৃবৃন্দের অন্ধভক্ত না হয়ে যাওয়া এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা। আপনি আপনার ভাইকে প্রশংসা করছেন মানে তাকে জবাই করে দিলেন। যেহেতু তাদের অন্তরও আমাদের অন্তরের মতই। আর আপনি তাকে 'মহান নেতা, মহান দায়িত্বশীল' বলে সম্বোধন করছেন।

কোন জিনিসটি ফেরাউনদেরকে ফেরাউন বানিয়েছিল? জাঁকজমক, কথা ও এই ধরণের বিষয়গুলো।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহ আমাদেরকে তার আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন। এবং তার অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখুন! আমিন! নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

চিন্তাধারা সিরিজ

০৮

ব্যক্তিবিশেষের ভুল-ত্রুটি

শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৮

ব্যক্তিবিশেষের ভুল-ত্রুটি

শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



একটি বিষয়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হয়, খুব গুরুত্ব দিতে হয়। তা হল সৈন্যদের ভুল-ত্রুটির বিষয়। যেকোনো মানবীয় কাজে ভুল-ত্রুটি হবেই। বিশেষ করে যদি তা দলীয় কাজ হয়। কিন্তু ভুল-ত্রুটি বলার ক্ষেত্রে একটি পার্থক্য আছে। কেউ ভুলের কথা বলে তা–ঠিক করার জন্য, সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং যথাসাধ্য সংশোধন করার জন্য আর কেউ ভুলের কথা বলে–কটাক্ষ করার জন্য এবং এটাকে জিহাদ বর্জনের ওযর হিসাবে পেশ করার জন্য।

বিশেষতঃ অনেক ভুল এমন আছে, যেগুলো পথ ও পদ্ধতির ভ্রান্তি প্রমাণ করে না বরং কখনো সেগুলো হয় ব্যক্তি বিশেষের ভুল কখনো বা এমন কোন মাসআলায় একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যাতে ইখতিলাফের অবকাশ আছে। বা কখনো কেউ একটি বিষয়কে এমন স্থানে প্রয়োগ করে, যে স্থানে তা প্রয়োগযোগ্য নয়।

সাধারণত সৈন্যদের ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে পূর্ব হতে যেহেনে গেঁথে যাওয়া ধারণার আলোকে কথা বলা হয়। তাই যেমনিভাবে প্রতিটি সৈন্যকে অবশ্যই সেনা ছাউনিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এবং তার পূর্বে শরয়ী কোর্সের সম্পন্ন করতে হয় তেমনিভাবে সব কোর্সেই সৈন্যদেরকে মুসলমানদের সাথে

উত্তম চরিত্র দেখানোর ব্যাপারেও তাগিদ দেওয়া আবশ্যক এবং মুমিনদের প্রতি নম্র, ‘আপসে দয়াশীল’-এই গুণগুলোর প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ কথার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে যে এ সকল মুসলিম যদিও আপনার সাথে সেই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যাতে আপনি আছেন, কিন্তু তারা ইসলামের গণ্ডির ভিতর আছে, যদিও জিহাদ পরিত্যাগকারী হোক না কেন, যদিও আপনার বিষয়ে আপনার বিরোধী হোক না কেন, কিন্তু তারা ইসলামের সীমার ভিতর আছে। তাই সাধারণ মুসলিমদের প্রতি যেরূপ অন্তরঙ্গতা রাখতে হয়, তাদের সাথেও সেরূপ রাখতে হবে।

একজন মুসলিমের আরেক মুসলিমের উপর যতটুকু অধিকার থাকে, তারও ততটুকু রয়েছে। এমনিভাবে কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হলে ভুলকারী সৈন্যদের থেকেও হিসাব নিতে হবে কখনো এমন সৈন্য ও সদস্য থাকে, যাদের অন্তরে কঠোরতা ও কড়াকড়ি থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে মানুষের মধ্যে তাদের রিযিক বণ্টন করেছেন, তেমনিভাবে তিনি তাদের মধ্যে তাদের আখলাক-চরিত্রও

বণ্টন করেছেন। তাই যার মাঝে কঠোরতা ও কড়াকড়ি থাকবে, তাকে এমন স্থানে রাখা হবে, যেখানে সাধারণ মানুষের সাথে তেমন গভীরভাবে মেশা হয় না। তার জন্য জিহাদের এমন কাজ দেখুন, যাতে সাধারণ মানুষের অধিক মেলামেশা নেই এমনিভাবে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, কর্মচারীরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রবান হয়, দৃঢ়তার সাথে নম্র হয়, এমন দৃঢ়তা সম্পন্ন হয়, যাতে রুক্ষতা থাকবে না। যেন অজ্ঞাতসারেই মানুষের নিকট তাদের দ্বীনকে ঘৃণিত করে না তোলে।

চিন্তাধারা সিরিজ

০৯

কেন কৌশল অবলম্বন

শায়খ নাসির আল আনিসি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৯

কেন কৌশল অবলম্বন?

শায়খ নাসির আল আনিসি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



এটাও একটি আলোচ্য বিষয় যে, আমরা কেন রাজনৈতিক কৌশলের প্রতি গুরুত্ব দেই? যেন আমাদের ব্যাপারে পাশ্চাত্যেও অবজ্ঞা এবং বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে তাদের অবজ্ঞার চূড়ান্ত সীমা দেখে নিতে পারি তারা আমাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবজ্ঞা করে ফলে তারা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যেটা খৃষ্টপূর্ব যুগে ব্যবহার করা হত তারা এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাথে এমন রাজনৈতিক চাল চালে তাদের ভাষ্যমতে যেটা খৃষ্টপূর্ব যুগে রোমানরা ইহুদী ও অন্যান্য জাতির সাথে চালত দেখুন, কোন স্তরে গিয়ে তারা আপনাদের ব্যাপারে বলছেঃ এরা কিছু বোঝে না অর্থাৎ আমরা তাদের সাথে সেই পুরাতন, প্রাচীন ও পরিত্যক্ত রাজনীতি ব্যবহার করবো। কিন্তু তারা এ সম্পর্কে কিছুই বুঝবে না! আপনি বুঝতে পারলেন, কি পরিমাণ অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্যের আচরণ করছে আমাদের সাথে?

যেমন খৃষ্টপূর্ব রোমান শাসনামলের বিদ্রোহগুলোতে ইহুদীরা ছিল নিপীড়িত এই বিদ্রোহের পূর্বে ইহুদীরা রোমানদের হাতে সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে ছিল। আর রোমানরা সর্বদাই মূর্তিপূজারী ছিল। অতঃপর যখন রোমানরা ইহুদীদের উপর বিজয়ী হয়েছিল, তখন তারা ইহুদীদের সাথে কেমন আচরণ করেছিল?! যেমন খৃষ্টপূর্ব রোমান শাসনমলের বিদ্রোহগুলোতে ইহুদীরা ছিল নিপীড়িত এই বিদ্রোহের পরে ইহুদীরা রোমানদের হাতে সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে ছিল। আর রোমানরা সর্বদাই মূর্তিপূজারী ছিল

অতঃপর যখন রোমনরা ইহুদীদের উপর বিজয়ী হয়েছিলো, তখন তারা ইহুদীদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলো?!

তারা ধর্মত্যাগী ইহুদীদেরকে ধরে আনত, যেমনটা ইতিহাস ও বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনার গ্রন্থাদির বিবরণ দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ যারা মূলত ছিল ইহুদী, কিন্তু নির্যাতন ও ভয়-ভীতির কারণে ইহুদী ধর্ম থেকে ফিরে এসেছে। রোমানরা তাদেরকে ধরে ইহুদীদের ধর্মগুরু হিসাবে নিয়োগ দিত অতঃপর তারা ইহুদীদের উপর দ্বীনের নামে রোমানদের আকীদা ও রীতি-নীতিগুলো চালিয়ে দিত।

এখন কি এই রাজনীতিটাই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে না? যেকোনো স্থানে এসে আপনার জন্য একজন ‘কারযাই’ মনোনীত করবে।

আপনার জন্য একজন ‘আলাবী ও এধরণের দালালকে মনোনীত করবে, দ্বীনের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর সে একটি আরবি নাম ধারণ করে। বা একজন মুসলিমের নাম ধারণ করে বা আমাদের স্বদেশীয় কোন নাম ধারণ করে আপনার জন্য দ্বীনের কল্যাণ ও মানুষের কল্যাণ নির্ধারণ করবে অতঃপর সেটাকে আমাদের উপর প্রয়াোগ করবে। অথচ তার পুরোটাই কুফরি নীতি, কুফরি আকিদা ও কুফরি বিধি-বিধান। এভাবে তারা আমাদের উপর তাদের কুফরি বিধানগুলো চালিয়ে দেয়। যেগুলোকে আমরা তাদের ধর্ম হিসাবে গণ্য করে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করতাম। আর তা করে এমন কিছু মুখ ও শরীরের মাধ্যমে, যাদের হকিকত আমরা জানি যে, তারা মুরতাদ। অর্থাৎ এখন যদি আপনি একজন মুরজিয়ার কাছেও যান এবং তার সাথে শাসকদের ব্যাপারে কথা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

তাহলে আল্লাহর কসম! আপনি যখন তার নিকট কুফরের বিধি-বিধানগুলোর আলোচনা করবেন- তখন সে কি বলবে? সে বলে দিবেঃ এটা ছোট কুফর!

অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের শাসকদের ব্যাপারে আমাদের বিতর্ক হলঃ তারা কি ছোট কুফরে লিপ্ত, না বড় কুফরে? অর্থাৎ তাদের মাঝে আর আমাদের এ নিয়ে বিতর্ক নয় যে, তারা কি দায়িত্বশীল, বা তারা কি এমন? অর্থাৎ ব্যাপারটি এ পর্যন্ত যে, আমাদের মাঝে ও মুরজিয়াদের মাঝে বিতর্ক হলঃ আমাদের শাসকরা কি বড় কুফরিতে লিপ্ত না, ছোট কুফরিতে? তো এ সকল লোকগুলোই আমাদেরকে শাসন করছে, এরাই আমাদের উপর পাশ্চাত্যের আকীদা-বিশ্বাসগুলো চালিয়ে দিচ্ছে।

এবার আমরা ফিরে দেখি, ইহুদীদের ব্যাপারটি, রোমানরা তাদের সাথে কি করত? আমরা বলে এসেছি যে, তারা ধর্মত্যাগী ইহুদীদেরকে ধরে ইহুদী ধর্মের গুরু বানিয়ে দিত এবং তাদের মাধ্যমে সকল রোমান মূর্তিপূজারী আকীদা ও বিধি-বিধান চালু করিয়ে দিত শুধু তাই নয়, তারা শুকর ধরে আনত, যেটা ইহুদীদের উপর হারাম

তারপর সেটাকে ইহুদীদের জবাইখানায় জবাই করত, যেটাকে ইহুদীদের ইবাদতের স্থান ও পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হত এখন আমরা দেখতে পাই, কিছু কিছু মুসলমানদের সন্তান মসজিদের মিম্বরে উঠে কুফরি আকীদার প্রতিবাদ করার পরিবর্তে তা চালু করার জন্য নগর রাষ্ট্রের দিকে আহ্বান করে, গণতন্ত্রের দিকে আহ্বান করে অর্থাৎ ইবাদতের ঘরগুলোতেও তোমার দ্বীনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছে।

একই রাজনীতি, যেটা পূর্বে ব্যবহার করা হত, সেটা এখন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে দেখুন, এই জনগণের অজ্ঞতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে! কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, অন্যান্য জাতির পক্ষ থেকে এই জাতির প্রতি অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য!

চিন্তাধারা সিরিজ

১০

মতবিরোধ থেকে সাবধান

শায়খ হামজা আল হাত্তার রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১০

মতবিরোধ থেকে সাবধান

শায়খ হামজা আল হাত্তার রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



তাই অনেকসময় আপনাকে কিছু বিষয় ছাড় দিতে হবে।

অনেকগুলো কারণেই আপনাকে উৎকৃষ্টতরের উপর উৎকৃষ্টকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন একতা ঠিক রাখার জন্য। এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

কেননা ভাই! সর্বদাই ঝগড়া ব্যর্থতার কারণ। মতবিরোধ ব্যর্থতার কারণ। তাই আপনাকে মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদিও আপনার ঝগড়া এমন বিষয়েই হোক না কেন, যেটাকে আপনি অধিক সঠিক মনে করেন।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখেন, ওটাও সঠিক, ব্যাস! তখন আপনি সঠিকতরের থেকে সঠিকের দিকে নেমে আসুন। উৎকৃষ্টতরের থেকে উৎকৃষ্টের দিকে নেমে আসুন। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

❝ আপনি অনেক সময় বুঝতে পারবেন যে, আপনার বিপরীত মতটি ভুল সেক্ষেত্রে আপনি তো অবশ্যই নিজেকে ভুল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন। ফলে সেখানে কিছু ঝগড়া হবে অথচ পরিশেষে তার এই নিয়মটি সর্বদা ঠিক থাকবে না। ❞

শায়খঃ চমৎকার! আমরা প্রথম উদাহরণে বলেছি যে, আপনি অধিক সঠিকটার জন্য চেষ্টা করবেন কিন্তু এখন কথা বলছিঃ যখন আপনি জানতে পারবেন যে, যে কোন একটি হওয়া সম্ভব। হয়ত এটা হবে, নয়ত ওটা হবে অর্থাৎ হয়ত প্রথম বিষয়টি হবে, যেটা উৎকৃষ্টতর কিন্তু তখন অনেকের অন্তর ভার হয়ে থাকবে, মন বিগড়ে যাবে এবং মতবিরোধ চলতে থাকবে অথবা আমি আমার মত বা আপনার মত কার্যকর করে দিবো তখন আপনাকে নিজের মনের চাহিদা থেকে নেমে আসতে হবে। এই বিষয়ে আপনি ছাড় দিবেন। যাতে কল্যাণ লাভ হয় কিন্তু আপনি যদি নির্দিষ্ট কোন আশ্বাস প্রদান করেন বা এমন লোকদের মাধ্যমে বিষয়গুলো সংশোধন করতে পারেন, যারা মীমাংসা করে দিবে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে মীমাংসা করতে পারেন, তাহলে তো সেটা ভাল। এটাই উৎকৃষ্টতর।

আপনি উৎকৃষ্টতর পন্থায় কার্য সম্পাদন করলেন। কিন্তু যখন এমন হয় যে, আপনি কিছুতেই পারবেন না আপনার কথা চলতে গেলে মতবিরোধ সৃষ্টি হবে, অনেক মন

ভার হয়ে থাকবে, বিদ্বেষ, শত্রুতা, গীবত, চোগলখোরি ইত্যাদি চলতে থাকবে, তারপর হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-কাটাকাটি হবে!!

যখন নবী ﷺ নবী হওয়া সত্ত্বেও সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তাদের মতামত দেখতেন এবং কখনো তাদের মতের দিকে নেমে আসতেন। যেমনঃ কাবার বিষয়টা। নবী ﷺ চাইতেন, তা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ভিত্তির উপর হোক এ প্রসঙ্গে তিনি আয়েশা রাঃ কে বলেনঃ যদি তোমার কওম সবেমাত্র শিরক ও কুফর থেকে উঠে আসা হত। তাহলে আমি কা'বাকে ইবরাহীমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতাম। তাহলে কেন নবী ﷺ নিজে সরাসরি এটা করলেন না?

যেহেতু এ বিষয়গুলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না। অর্থাৎ যেহেতু তারা এখনো কেবলার দিকেই আছে, কেবলা পরিবর্তন হয়ে যায়নি যেমন নবী ﷺ তো এতে রাজি হননি যে, তারা কেবলা পরিবর্তন করে তা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে করবে অথবা অন্য কোন দিকে করবে তাহলে এটা একটি আল্লাহর নির্দেশ এবং শরয়ী বিষয়, কিন্তু নবী ﷺ শরয়ী রাজনীতিতে মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বিষয়ে ছাড় দিলেন তাই মানুষের প্রতি লক্ষ্য করা এবং ধাপে ধাপে দাওয়াত দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বিষয়।

এজন্য দায়ি ও তালিবুল ইলমকে অবশ্যই ইলম শিখতে হবে। এবং ইলম অন্যের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতিও শিখতে হবে। দাওয়াত প্রচারের পদ্ধতি ও শরয়ী রাজনীতিও শিখতে হবে একারণেই ইমাম মালিক রহঃ অতি উত্তম কথা বলেছেনঃ তিনি বলেনঃ "আমি কাবাকে শাসকদের হাতে খেলার পাত্র হতে দিবো না। তাই অনেক সময় আপনি বলতে পারেন, এটা হল সর্বোত্তম আমরা বলবোঃ হ্যাঁ, উত্তম হল কাবাকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করা কিন্তু তাতে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ সৃষ্টি হবে।

তাই আমরা এটাকে মুলতবি রাখবো আর এর উপর অনেকগুলো বিষয় ভিত্তি করে। একারণেই শরয়ী রাজনীতিতে কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয় দেখতে হবে এবং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ও দেখতে হবে আর কাজ সফল হবে যখন আমরা নিজস্ব স্বার্থের প্রতি সামান্যও তাকাবো না কেউ যখন নিজস্ব স্বার্থের দিকে তাকায়, চাই সে সৈনিক হোক, আমির হোক বা মামুর হোক, তখন কাজ কখনোই

সফল হবে না যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি.. আর এটা নির্ভর করে নিয়্যত পরিশুদ্ধ হওয়ার উপর..

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী- জেনে রেখঃ দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যখন তা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পুরো দেহ শুদ্ধ হয়ে যায় আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখঃ সেটা হল কলব (হৃদয়)।

যখন নিয়্যত নেক ও সঠিক হয় এবং আপনি এই কাজের মাধ্যমে শুধু আল্লাহর নৈকট্যই কামনা করেন তখন আল্লাহর অনুগ্রহে অচিরেই কাজ সফল হবে। যেহেতু আপনি নিজস্ব স্বার্থ পরিত্যাগ করেছেন, আপনি কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। আর নবী ﷺ কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। পরিষ্কার ভাই?

এই মাসআলাটি ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় হবে। এই মাসআলাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একতা ঠিক রাখার জন্য এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার চাকা দ্রুততর হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন তা আমাদের হাতেই হয়।

চিন্তাধারা সিরিজ

১১

নিকটবর্তী শত্রু

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ– ১১

সর্বাধিক নিকটবর্তী শত্রু

শায়খ কাসিম আর-রিমি (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন[১])

অনুবাদ ও প্রকাশনা



AL HIKMAH MEDIA

[১] এই বয়ান যখন প্রকাশিত হয়, শাইখ রহিমাহুল্লাহ তখন জীবিত ছিলেন, তাই দুয়া এভাবে লেখা হয়েছে।

আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাহ বলছেন, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাহু আরো বলছেন, বর্তমানে আয়িম্মাতুল কুফর (কুফরের নেতৃবর্গ) কারা? যাদের ব্যাপারে বর্তমানে সকলে একমত? কে সেই প্রধান, যে সকল মানুষের কলকাঠি নাড়ছে? যে টিকে থাকলে তার দাওয়াত টিকে থাকবে এবং ধ্বংস হয়ে গেলে তার দাওয়াতও ধ্বংস হয়ে যাবে? সে হল আমেরিকা। কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে না তাই আপনারা যখন বাস্তবতারা প্রতি দৃষ্টি দিবেন যে কে সকল মানুষকে জড়ো করছে, ঐক্যবদ্ধ করছে, তখন দেখবেন, সে আমেরিকা ছাড়া আর কেউ নয় এটা একটি বাস্তব বিষয়। তাদের মন এটাকে বদ্ধমূল করে নিয়েছে। এটা বড় মনে করা বা সম্মান করা নয়; বরং এটি একটি বাস্তবতা যেমন আমাদের নিকট কুরাইশও আছে, আমাদের নিকট গাতফানও আছে, তো আমরা কুরাইশ সম্পর্কে কথা বলছি তাহলে আয়িম্মাতুল কুফর কারা?

এখন যদি আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে কথা বলতে চাই, তাহলে আয়িম্মাতুল কুফরকে এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ করে ফেলবো কিন্তু যখন যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলবো আর বর্তমানে তো পুরো পৃথিবীর যুদ্ধকে একটি যুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়, তখন দূরবর্তীরাও নিকটবর্তী হয়ে যাবে। এখন যদি আমি এসে হাযরা মাউতের একটি কোণাকে নির্বাচন করি এবং আমার সকল কর্ম ও সকল জিহাদকে এই অঞ্চলের উপরই নির্ভরশীল করি, তাহলে এটা ভুল হবে কোথায় উম্মাহর দেহ, 'যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তার জন্য সমস্ত দেহে জ্বর ও অনিদ্রার মাধ্যমে সাড়া পড়ে যাবে?

আমরা এক জাতি। যে ওখানে আছে, সে-ই হুবহু এখানেও আছে যখন আমি আমার নিজের প্রতি দেখবো, তখন আমি ভূ-সীমায় বিশ্বাস করবো তখন আমি নিজেকে উম্মাহ থেকে পৃথক করে ফেললাম, নিজেকে যুদ্ধ থেকে পৃথক করে ফেললাম বর্তমানে আহলুস সুন্নাহর অবস্থা: উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমানে ইয়েমেনে আমাদের নিকট হুথিরা দুর্বল কিন্তু তাদের নেতৃত্ব একক। ফলে তারা সকল স্থানে লড়াই পরিচালনা করতে পারছে আহলসু-সুন্নাহ অনেক, তাদের সামনে সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু তাদের পরিচালনাকারী একক নেতৃত্ব নেই ফলে এক পক্ষ দলীয় শক্তিতে কাজ করে, আর অপর পক্ষ নিজ শক্তিতে কাজ করে। অর্থাৎ শুধু যেই গোত্রটি লড়াই করছে, তারাই তাই যদি হুথিরা তাদের সীমানা থেকে বের হয়ে

যায়, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে! অমুক অঞ্চল থেকে বের হয়ে গেল, তো যুদ্ধ শেষ! এটা ভুল কিন্তু যখন যুদ্ধ একটি হবে, যখন আমরা উম্মাহর দৃষ্টিতে দেখবো যে, কে প্রকৃত শত্রু?

উম্মাহর দৃষ্টিতে; ইয়েমেন, ইরাক, আফগানিস্তান বা সোমালিয়ার দৃষ্টিতে নয়। বরং উম্মাহর দৃষ্টিতে: কারা প্রকৃত শত্রু? তারা হল আমেরিকানরা

শরয়ীভাবে কি আমাদের জন্য শুধু নিজের দৃষ্টিতে দেখা বৈধ হবে, নাকি উম্মাহর দৃষ্টিতে দেখতে হবে?

এটা কি শুধু রাজনীতি? না বরং বিষয়টি হল শরয়ী মূলনীতির।

আমার জন্য শুধু নিজের দৃষ্টিতে দেখা জায়েয নেই, বরং উম্মাহর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমি উম্মাহর হককে নিজের হকের উপর প্রাধান্য দিব। যখন আমি নিজের হককে উম্মাহর হকের উপর প্রাধান্য দিব, তখন আমি জালিম। আমি শরয়ী গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হলাম। তাই আমরা এখন মুসলিমদের রক্ত নিয়ে কথা বলবো, যা শ্রেষ্ঠ যুবকগণ ময়দানে পেশ করেছে, যারা ময়দানে যুদ্ধ করছে।

তাই আসুন, আমরা কথা বলার সময় উম্মাহর দৃষ্টিতে দেখি, একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধের দৃষ্টি দেখি। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে না দেখি। এমনটা করলে আপনি উম্মাহর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন।

আমরা একমত হলাম যে, প্রথম শত্রু হল আয়িম্মাতুল কুফর (কুফরের নেতৃবর্গ) আমরিকানরা। তারপর ধারাবাহিকভাবে.... একের পরে এক ছোট থেকে ছোট... আপনার সূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছে । এই হল আয়িম্মাতুল কুফর। এবার আসি, আমাদে র নিকটবর্তী কুফ্ফার কারা?

উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে আমরা ইয়েমেনে আছি, আমাদের যুদ্ধ বা যে আমাদের উপর হামলা পরিচালনা করছে, সে হল আব্দে রাব্বিহ। আচ্ছা আব্দে রাব্বিহ কি আমাদের কোন ক্ষতি করেছে? না আমরা তার কোন ক্ষতি করেছি। এক্ষেত্রে কোন তুলনা নেই। ছোটও মারে, বড়ও মারে, প্রত্যেকেই মারে। সে হল দুর্বল, শক্তিহীন কিন্তু আমাদের উপর আঘাত করছে কারা? আমেরিকানরা। এটাই হল বাস্তবতা

কে কার্যগতভাবেই আমাদের নিকটবর্তী, পুস্তকে বা কথায় নয়, সে কি আব্দে রাব্বিহ? আব্দে রাব্বিহ আছে রিয়াদে কিন্তু আমেরিকান ও আমাদের মাঝে

মোটামুটি ৪০ মাইল, অর্থাৎ ৬০ কিলো সামুদ্রিক পথের দূরত্ব আর আকাশপথে তাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে দূরত্ব মাত্র ৩ বা ৪ কিলো। তাহলে আমাদের নিকটবর্তী শত্রু কে?

আয়িম্মাতুল কুফর আমেরিকানরাই। এখানে আমাদের নিকটবর্তী শত্রু হল আমেরিকানরা।

আমি বলেছি যে, আমরা যখন বাস্তব অবস্থার দিকে আসবো আর আমি কোন মসস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলছি না বরং বাস্তব-ঘটিত বিষয় নিয়ে কথা বলছি। কাফেরদের মধ্যে কি আমাদের নিকটবর্তী, এমনকি আব্দে রাব্বিহর উপস্থিতির সময়েও, এমনকি মুরতাদ সরকার তার শক্তিসহ উপস্থিত থাকার সময়েও, কে তখন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে এবং আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে? এই দালাল সর্বোচ্চ যা করতে পারবে তাতে হয়ত একটি কাঠের টুকরা জ্বলবে। সর্বশেষ যা করতে পারবে তা হচ্ছে আপনি যে ঘরে আছেন, তা দেখিয়ে দিবে, যাতে তারা বোমাবর্ষণ করতে পারে। তারা একটুকুই করতে পারবে কিন্তু তারা নিজেরা আমাদের থেকে পলায়ন করবে। এটি একটি বাস্তব-ঘটিত বিষয়।

এবার আমরা আরেকটি বাস্তব বিষয়ের আলোচনায় আসি আব্দে রাব্বিহর টিকে থাকা কি তার ইচ্ছা মত? আমেরিকাই তো তাকে ছুড়ে ফেলেছে এজন্যই এখন দেখবেন, বিভিন্ন ভাষণে সে বলেঃ আমেরিকা আমাদের সাথে আছে, তারা আমাদের সমর্থন করেছে এটা কি কল্পনা করা যায় যে, সে আমেরিকার সন্তুষ্টি ছাড়া টিকে থাকতে পারবে? এটা অসম্ভব

তাহলে সর্বশেষ বোঝা গেল, এরা হল তাদের হাতিয়ার মাত্র। তাহলে এখন আমি যখন যুদ্ধ করবো, তখন কি মাথার সঙ্গে যুদ্ধ করবো, নাকি আঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো?

যখন আমি ও আমার একজন শত্রু যুদ্ধ করবো, তখন আমি তাকে কোথায় আঘাত করে হত্যা করবো?

আমি কি তাকে হত্যার সম্ভাব্য স্থানে আঘাত করবো, নাকি তার পায়ে আঘাত করবো?

আপনি যদি তাকে বন্দী করতে চান, তাবে হাতের উপযুক্ত স্থানে আঘাত করবেন আর যদি তাকে খতম করে দিতে চান, তাহলে ঘাড়ের উপযুক্ত স্থান, তথা মৃত্যুর স্থানে আঘাত করবেন ধরুন এখন আমার নিকট একজন শত্রু আছে। তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য থেকে কোথায় আমি তাকে আঘাত করবো?

নিশ্চয়ই আমি তাকে মৃত্যুর উপযুক্ত স্থানে আঘাত করবো। তাহলে কে প্রকৃতপক্ষেই আমাদের নিকটবর্তী? আব্দে রাব্বিহ বা অন্যন্যরা নয়; তারা তো হাতিয়ার মাত্র।

আমরা যখন মুরতাদদের দিকে তাকাবো, যারা আপনাকে শাসন করছে দেখতে পাবো, তাদের সকল আইন-কানুন, সকল প্রশাসন ও রাজনীতি কেন্দ্রীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ নিরাপত্তাবলয় একটি সেখানে একটি নিরাপত্তা কক্ষ রয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে তা সকল আরব দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। আপনার জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তি আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের অনুগামী তাই প্রতিটি জিনসি তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর ভিত্তিও বড় বড় জাতিগুলো তথা জাতিসঙ্ঘের সাথে। সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতিসহ সব কিছুর গোঁড়া একটি প্রমাণিত হলঃ আয়িম্মাতুল কফর (কুফরের নেতৃবর্গ) ও আমাদের নিকটবর্তী শত্রু একই ।

আচ্ছা এবার আসুন আমরা দ্বিতীয় রূপটির দিকে তাকাই। এটাকে ভিন্ন দিক থেকে আহরণ করি। তা হল আঘাত করা ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ।

কেউ আপনাকে বললঃ আমরা যে যুদ্ধ করছি, এর দ্বারা কি আঘাত করে দুর্বল করা হচ্ছে, নাকি কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে?

আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা বলছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

অর্থাৎ সর্বশেষে আমাদের যুদ্ধ হল, যেন দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, যেন আমরা শরয়ী শাসন দ্বারা শাসিত হতে পারি , তারপর আসবে কতৃত্ব। আঘাত করার মধ্য দিয়েই সর্বশেষে এ স্তরে পৌঁছ যাবে। তাই এটা অযৌক্তিক যে, একজন এসেই বলবে, আমি কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করবো। হাস্যকর কথা! কতৃত্বের যুদ্ধের সময় আসে ধাপে ধাপে। অনেকগুলো অভিযানের পরে প্রতিদিন আপনার শত্রুকে

আঘাত করতে করতে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন। তাই রাতারাতি বা দিনাদিন এ পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন কি প্রথমেই তিনি কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করেছেন, সাহাবিদেরকে নিয়ে মক্কা দখন করতে গিয়েছেন? এটা অসম্ভব বরং তিনি ৮ বছর পরে গিয়েছেন।

প্রথম প্রথম শত্রুকে তার দুর্বল স্থানে আঘাত করেছেন, শত্রুর দুর্বল স্থান অনুসন্ধান করে তাতে আঘাত করুন, তার শক্তিশালী স্থান খুঁজে তাতে আঘাত করতে যাবেন না। এটু ভুল। শত্রু সবচেয়ে দুর্বল থাকে চলন্ত অবস্থায় একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পথিমধ্যে তাদের যাওয়া-আসার পথে টার্গেট করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা নিক্ষেপ করে, আরোহণ করো। আর তোমাদের নিক্ষেপ করাই আমার নিকট আরোহণ করা অপেক্ষা উত্তম"। তাই যদি আপনি শত্রুর ক্ষতি করলেন, কিন্তু সে আপনার ক্ষতি করতে পারল না, তবে এটাই উত্তম বরং এটাই আপনার উপর ওয়াযিব, বিশেষ করে যখন আপনি জানবেন যে, সম্মুখ লড়াই আপনার সাথীদের জন্য অনেক বিপদজনক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিক্ষেপ করো এবং আরোহণ করো।"

ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারি এবং বর্শার মাধ্যমে যুদ্ধ করা হয় কিন্তু যদি দূর থেকে নিক্ষেপ করো, তাহলে শত্রুর ক্ষতিসাধন করতে পারবে।

এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এই বাণীর তাফসীরে বলেন- জেনে রেখ, কুওয়াহ (শক্তি) হচ্ছে নিক্ষেপ করা! জেনে রেখ, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা! জেনে রেখ, কুওয়াহ (শক্তি) হচ্ছে নিক্ষেপ করা। মানুষ সাধারণ অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে, সেটা হচ্ছে তরবারি। যা সকলের জন্য একক অস্ত্র ।আপনি অনেক মানুষকে দেখবেন, তরবারি ভাল পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু তীর চালাতে পারে না। আবার যে তীর ভাল চালাতে পারে, তার হাতেও অবশ্যই তরবারি থাকতে হয়, যাতে সেটা দিয়েও যুদ্ধ করতে পারে। এটাই সাধারণ অস্ত্র। ধরুন আমাদের এক ভাইয়ের নিকট একটি আরপিজি আছে। কিন্তু তার নিকট ক্লাশিনও আছে, যা দিয়ে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বলেছেনঃ জেনে রেখ, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, এটা এর গুরুত্বের কারণে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদিসে আরো বলেনঃ যুদ্ধ হল ধোঁকা। অর্থাৎ যুদ্ধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধোঁকা।

মুহাদ্দিসগণ বলেনঃ এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করছেন যে, সরাসরি ও মুখোমুখি যুদ্ধ করার চেয়ে ধোঁকার মাধ্যমে যুদ্ধ করাই উত্তম। কারণ সরাসরি যুদ্ধে যেমন আমি শত্রুর ক্ষতি করি, তেমনি শত্রুও আমার ক্ষতি করে।

কিন্তু আমরা যদি এ আলোচনার মধ্যে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ও দুর্বল করার যুদ্ধের আলোচনায় ফিরে আসি, তবে আমরা বলবো এখন আমাদের সামনে আছে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, মাগরিব, ইয়েমেন, চেচনিয়া, পাকিস্তান, সুদান...

অনেকগুলো অঞ্চলই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, এমন একটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, যা ইসলামী শরীয়া দ্বারা শাসন করত কিন্তু তারপর ফলাফল কি হয়েছিল? আমাদেরকে অবশ্যই এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

ফলাফল হল, আফগানিস্তানে আমেরিকা আসলো , কয়েক দশক রাষ্ট্রকে একত্রিত করল। তারপর সকলে মিলে এই একটি দেশের উপর আক্রমণ করল, তারপর সকলে মিলে ইরাকে আক্রমণ করল, তারপর সিরিয়ায়,তারপর ইয়েমেনে, তারপর সোমালিয়ায়, তারপর কতদিন পর্যন্ত এটা চলবে?!

কতদিন পর্যন্ত এটা চলবে?

আমরা যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার এই স্পষ্ট আয়াতের দিকে ফিরবো- আমাদের সামনে আছে ফিতনা, তথা কুফর ও শিরক । তাই এই যুদ্ধের শেষ সীমা হল ফিতনা হয়ে যাওয়া এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া ।

যখন ফিতনা শেষ হয়ে যাবে, তখনই দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে। لا إله إلا الله "কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া"।

আগে খালি করা বা পরিষ্কার করা, তারপর সুসজ্জিত করা ।

আমি এখানে একটি রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করলাম, তারপর তারা সমবেতভাবে সেখানে এসে আঘাত করল।

তারপর আমি আরেক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলাম, তারা তাদের সকল শক্তি একত্রিত করে আমাদেরকে এক এক করে ও জামাতবদ্ধভাবে আক্রমণ করল। আমরা কেন আমাদেরকে যেটার আদেশ করা হয়েছে, সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখবো না। এক দেহ

আমরা প্রত্যেকেই আয়িম্মাতুল কুফরের প্রতি মনোনিবেশ করবো, যারা আমাদের নিকটবর্তী তাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো। আমরা সকলে তাকে আঘাত করবো। তারা সবাই শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা প্রত্যেকে দাঁড়াবো, যারা ইরাকে আছে, তারা দাঁড়াবে, যারা আফগানিস্তানে আছে, তারা দাঁড়াবে, যারা সিরিয়ায় আছে তারা দাঁড়াবে, যারা ইয়েমেনে আছে তারা দাঁড়াবে, মাগরিব, সোমালিয়ায় যারা আছে, সকলে দাঁড়াবে।

তাই শিরকের সমাপ্তিই অনিবার্যরূপে ইসলামের প্রতিষ্ঠা।

আমরা চাই না, শত্রুরা আমাদেরকে ধোঁকা দিক, তারা তাদের পদ্ধতিতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক, আমাদেরকে ময়দানে বের করে আনুক।

শত্রুরা তো সম্মুখ যুদ্ধে পারদর্শী। কেন? কারণ তাদের অনেক উপকরণ রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেনে রেখ, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা। তো তাদের নিকটও নিক্ষেপ শক্তি রয়েছে।

এখানে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করা হয়েছে। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে নিক্ষেপের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। তো তাদের নিকট এমন উপকরণ রয়েছে, যা আমাদের নিকট নেই। আর আমরা এর উপর ভরসা করি না। কিন্তু আমাদের নিকট রয়েছে দু'টি বিষয়, আমরা তা গ্রহণ করবো। তা পরিত্যাগ করা গুনাহ।

এগুলো হল উপকরণ। আর এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়া শিরক, তাই আমরা এর উপর নির্ভরশীলও হয়ে পড়বো না, আবার তা একেবারে পরিত্যাগও করবো না।

এখন শত্রু এই পদ্ধতিটি ভাল পারে, সম্মুখযুদ্ধের পদ্ধতিটি। আর আমরা ধোঁকা বা কৌশলের পদ্ধিতিটি ভাল পারি। সুতরাং আমরা তাদেরকে আমাদের গণ্ডির ভিতর

নিয়ে আসবো এবং আমাদের পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এমনটা নয় যে, তারা আমাদেরকে টেনে আনবে। আমাদেরকে টোপ দিবে, প্রতিদিন টোপ দিতে থাকবে যে, তোমরা উম্মাহর যুবক ও বাহাদুরদেরকে বের কর। অতঃপর যখনই ফল পেকে যেতে দেখবে তখন তোমার জন্য একটি রূপরেখা আবিষ্কার করবে। তোমাকে টোপ দিবে , যখনই আমরা শত্রুর সাথে পরিপূর্ণ উদ্যমতার সাথে যুদ্ধ করি, তারপরই আমরা এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হই, যখন পথ থেকে সরে পড়ি।

আমাদের ভেতরেই থাকে বিভিন্ন গোপন শত্রু, আবার বাহির থেকেও শত্রু এসে যুক্ত হয়। তাহলে এটা সরে পড়া নয়; বরং টোপের মুখে পড়া। আমাদের উপর আবশ্যক হল আমরাই তাদেরকে টোপে ফেলবো। আমরা তাদেরকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দিব না।

দেখুন, শত্রুরা কিছু ব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। তারা চাচ্ছে যেকোনো উপায়ে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে দিতে, আপনাকে সম্মুখযুদ্ধে আনতে।

আমি যখন আজকে একটি অঞ্চলে এসে বলবোঃ আমি এখনই শরীয়া চাই, তখন আমি তো বলবো, দিব্যদৃষ্টিতে। কিন্তু আপনি এমন বিষয় ঘটালেন, যা অপরপূর্ণ, এটা কি আপনার জন্য জায়েয হবে?

এখনও যোহরের সময় আসেনি, কিন্তু আমি নামায পড়ে আনন্দিত। অসময়ে নামায আদায় করে ফেললাম। আমার নামাযই তো ছহীহ হবে না।

যখন আলেমগণ দারুল হরবে হুদুদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

এখন যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, তাহলে তো ওই সবগুলোই দারুল হরবে বাস্তবায়িত হবে। কত হাস্যকর! কারণ তার শর্ত পূরা হয়নি।

শাসক প্রস্তুত কর, প্রতিরক্ষা প্রস্তুত কর।

এমন নয় যে, কাযী সাহেব বিচার করছেন, আর পরে দিনই তাকে যমীনের উপর হত্যা করা হল। এই শাসকের কি নিরাপত্তা?

শরীয়তের প্রভাব যমীনের মধ্যে শক্তিশালী হতে হবে। অন্যথায় তা দাবিই করবো না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ “নামসমূহ” শব্দটি একটি বড় জিনিস। কারণ এক উপর একটি হুকুম নির্ভর করে। তাই আমি এটাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করবো না।

আপনি বললেনঃ আমি খলিফা, আমি আমির।

প্রত্যেকেই নিজের একটা মত প্রকাশ করে। তাই যখন অবস্থা সুদৃঢ় হবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো, তখন আপনি এগুলো তার যথাযথ হকসহ গ্রহণ করবেন।

এই বিষয়টি বুঝতে পারলে প্রমাণিত হবে যে, এখানে একটি অঞ্চল, যাতে কিছু যুবক আছে।

এখানে একটি অঞ্চল, এখানে একটি অঞ্চল, যখন আমার তাতে নিজেদেরকে চাপিয়ে দিলাম, বললাম যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, তখন এর ফলাফল কি হবে? এর ভিত্তিতে অনেক হুকুম আবর্তিত হবে।

এখন আমরা সকল দলকে খতম দিলাম, তাহলে এর দ্বারা কারা উপকৃত হবে? অবশ্যই ঐ শত্রুরা, যাদের ব্যাপারে সকলে একমত এটি শুধু একটি নাম নয়। অর্থাৎ সহজ মনে করে যে কেউ তা ব্যবহার করবে, এমন নয়। বরং নামের উপর অনেক হুকুম আবর্তিত হয়। একারণেই নামের ভিত্তিতে সওয়াব বা গুনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই নাম দিয়ে দেওয়া এত সহজ নয়। এখন আপনি সকল মানুষকে অচল করে দিলেন।

এখন আমি আপনাকে বললামঃ সে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, এখন আমরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আছি। শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে হবে। এটাই আমাদের মাঝে ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাঝে বাঁধা হয়ে আছে। যখনই কোন স্থানে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই শত্রুরা এসে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এজন্য এখন আমাকে এই প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে। আমি আমার তরবারি তাক করবো এই প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে। যদি প্রতিটি দল বছরে একটি করে অভিযান করে, তাহলেই থেমে যাবে।

তাহলে বোঝা গেল, আমার দাবি করা এবং ফল আহরণ করতে চাওয়া মানে হল ফল নষ্ট করা।

আমি কিছু হুদুদ কায়েম করলাম কয়েক মাস, কয়েক বছর তারপর? এটাই কি আমাদের থেকে কাম্য? না। বরং আমি শত্রুকে প্রতিহত করবো, সেই তো আমাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিচ্ছে। এমনটা বলবেন না যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো।

আপনি আপনার দায়িত্ব করবেন এভাবে যে, আপনি সেই বাঁধা প্রতিহত করবেন, যা শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিচ্ছে। তাই আপনার উপর আবশ্যক হল, আপনি তাকে ধ্বংস করবেন। এমন নয় যে, তার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আতঃপর একটি কোণা বেছে নিয়ে তাতে শরয়ী হুকুম বাস্তবায়ন করবেন।

আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা কি শরয়ী হুকুমের অংশ নয়?

ঈমানের পর তার থেকে বড় ওয়াজিব কিছুই নেই যেমনটা শায়খুল ইসলাম বলেছেন। প্রত্যক্ষ কাজ হল, আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা। কিন্তু আপনি দারুল হরবে হুদুদ কায়েম করতে আসলেন!

যাইহোক, তখন আমি আপনাক বলবোঃ আপনি তো কথার মাধ্যমে এটা অবলম্বন করলেন, কিন্তু শত্রু তো এখানেই?!

তাহলে আপনি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বাদ দিয়ে সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হলেন। অর্থাৎ এটা একটি ওয়াজিব। আর ওয়াজিব থেকে ভিন্ন কাজে ব্যস্ত হওয়া মানে তাকে অবহেলা করা। আপনি এই ওয়াজিবটি ছেড়ে দিলেন। আপনি যতই আমল করেন, কিন্তু আপনি একটি ওয়াজিবে অবহেলা করলেন।

সবশেষে আমরা ফিরে যাই শত্রুর মাসআলায়। শত্রু দুই ধরণের, একটি হলঃ ভিতরগত শত্রু, আরেকটি হল বহিঃশত্রু। একটি হল, নিকটবর্তী শত্রু, আরেকটি হল দূরবর্তী শত্রু। গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? গুরুত্বপূর্ণ সেটাই যেটা তোমাদের উপর আঘাত করছে। তারা হল আয়িম্মাতুল কুফর, তারা আমাদের নিকটবর্তীও। আর এই শত্রুই আমাদের মাঝে ও আমাদের শরীয়ার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহঃ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার আলোচনায় একটি সুন্দর উপমা পেশ করতে গিয়ে বলেনঃ তুমি এখন পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে চাচ্ছো। তুমি পায়ে

হেটে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছো। সামনে অনেক সাপ-বিচ্ছু দেখতে পেলে তুমি যদি সেগুলোকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে তোমার সময় শেষ হয়ে যাবে, তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। অথচ আপনি ইবাদাতেও লিপ্ত। আপনাকে সাপ-বিচ্ছু মারতে আদেশও করা হয়েছে। কিন্তু আপনার নিকট এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে। তা হল গন্তব্যে পৌঁছা। তাই আপনি যখন এ কাজে লিপ্ত হবেন, তখন আপনার সময় চলে যাবে, আপনি উদ্দেশ্য হারাবেন। কিন্তু একটি সাপ আপনার পথের মধ্যে, সরাসরি আপনার সামনে থেমেছে, আপনি এটাকে মেরে ফেলুন। কারণ এটা আপনাকে বাঁধা দিয়েছে। কিন্তু যদি আপনি সব মানুষকে আপনার প্রতিপক্ষ বানান, আর শত্রুর অনুসন্ধানই করতে থাকেন, তাহলে কখন আপনার গন্তব্যে পৌঁছাবেন?

সারকথা হলঃ আমেরিকানরা আমাদের জন্য অনেক শত্রু সৃষ্টি করছে, যাতে আমাদেরকে তাদের থেকে অমনোযোগী রাখতে পারে এবং লড়াই আমাদের দেশে স্থানান্তর করতে পারে, ফলে তাদের দেশে লড়াইয়ের বিষয়টি আড়ালে থেকে যায়।

তাই আমাদেরকে এই বিষয়টিতে সচেতন হতে হবে। আল্লহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

চিন্তাধারা সিরিজ

১২

কারাগারে অবিচলতা

শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ– ১২

কারাগারে অবিচলতা

শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



একজন বন্দীর নিজ অবস্থানে দুই রকম অবস্থা হতে পারে। এটি বন্দী জীবনের একটি মূলনীতিঃ (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে-আপনাকে সকলকে তা থেকে নিরাপদ রাখুন!)

বন্দীকে যখন বন্দী করা হয়ঃ তখন যদি আপনার মূল চিন্তা হয়, আপনার দ্বীন এবং কিভাবে তার উপর অটল থাকবেন, তাহলে আপনি আল্লাহর হুকুমে অটল থাকতে পারবেন। আর যদি আপনার শুধু নিজের চিন্তা হয়, কিভাবে নিজেকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবেন, তাহলে আপনি ধ্বংস হবেন।

দ্বীনই আপনাকে আল্লাহর হুকুমে দৃঢ় রাখবে, যেহেতু আপনি একমাত্র আল্লাহরই আশ্রয় গ্রহণ করবেন বন্দী জীবনে সার্বক্ষণিকভাবে আপনার জন্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ থাকবে না। যখন কোন ব্যক্তিকে শুধু তার বিশ্বাসের জন্য বন্দী করা হয়। যখন শুধু আপনার ও সভ্যতার জন্য আপনাকে বন্দী করা হবে, সমস্ত মানুষ আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কেউ আপনার প্রতি দয়া করবে না, যে অবস্থায় আপনি হবেন এক আল্লাহতে বিশ্বাসী, আর সকল মানুষ আপনার বিরুদ্ধে থাকবে। তখন আপনার জন্য অন্য কেউ থাকবে না; একমাত্র আল্লাহ থাকবেন। আপনি কিসের জন্য বন্দী হলেন!? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জন্য।

তাই দ্বীনের উপর আপনার দৃঢ়তাই আল্লাহর হুকুমে আপনার মুক্তির মাধ্যম হবে। বন্দীত্ব থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে। এবং ঐ সকল ফেতনা থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে, যেগুলো কারাগারের ভিতরে থাকে। কারাগারের ভিতরের ফেতনা

কিন্তু যখন কারাগারে আপনার মূল চিন্তা হবে নিজের বিষয়ে, কিভাবে নিজেকে মুক্ত করবেন তখনই আপনি নত হবেন, তাদের পক্ষে বিভিন্ন কথা বলবেন, অবস্থা আপনার জন্য বড় কঠিন হয়ে যাবে এটি এমন দরজা, যাতে প্রবেশ করার পর গোলামী ব্যতীত কিছু নেই আপনি চূড়ান্তভাবে অধঃপতিত হবেন। আল্লাহর নিকট এর থেকে পরিত্রাণ কামনা করি।

বিশেষভাবে খৃষ্টানদের ফেতনাগুলো অনেক ভয়ংকর। যেমন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ খৃষ্টানদের কারাগারসমূহে মুসলিম বন্দীদেরকে নারীদের মাধ্যমে ফেতনায় ফেলা হয়। খৃষ্টানদের নিকট যখন কোন ভাই বন্দী হয়,

তারা আপনাকে প্রহার করবে না, বেত্রাঘাত করবে না, যদিও এগুলোর ব্যবস্থাও থাকবে, বরং তারা আপনাকে আপনার দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য নারীদের মাধ্যমে ফেতনায় ফেলবে। এই অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করেন, তারা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষই ফেতনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

যেমন বন্দী খুবাইব রাদিআল্লাহু আনহুর মূল চিন্তা ছিল দ্বীন। তিনি তার বিশ্বাস থেকে সামান্যও পিছপা হননি। তিনি মুশরিকদের নিকটে থেকেছেন, কিন্তু নিজ আকিদাসহ। এটা ঠিক যে, তার নিকট তাকে সঙ্গ দেওয়ার মত

ও মানসিকভাবে দৃঢ় রাখার জন্য কেউ ছিল না। কিন্তু তার অন্তরে যে দ্বীন ছিল এবং মুহাম্মদ ﷺ থেকে। প্রাপ্ত শিক্ষা তাকে সকল প্রতিকূল অবস্থাতে দৃঢ় রেখেছিল। অর্থাৎ যে আদর্শ আমরা বুকে লালন করি, তা পরিবর্তন হবে না

যে আদর্শ আমরা বুকে লালন করি, তা বহন করে এমন সব লোক, যারা সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অটল থাকে।

শুরু হল পরীক্ষা। তিনি কিছু সময় তাদের মাঝে বসলেন। আল্লাহ তা'আলার

পক্ষ থেকে তার অনেক কারামাত ও বিস্ময়কর অবস্থা প্রকাশ পেল এ সকল পরিস্থিতিসমূহে আল্লাহ তাকে দৃঢ় রাখলেন তারা তাকে ধরে হেরেমের বাইরে নিয়ে গেল এবং হত্যা করার জন্য শুলিতে চড়াল। শুলিতে চড়ানোর পূর্বে তারা তার বিশ্বাস যাচাই করতে চাইল, কিন্তু তারা আসলো দুনিয়াবি প্রস্তাবের মাধ্যমে। আবু সুফিয়ান আসলো, তার আকিদা যাচাই করতে। অনেক মানুষ এই পরীক্ষায় পড়ে ফেল করে৷ আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, মুহাম্মাদ তোমার স্থানে থাকবে, আর তুমি নিজ পরিবারে নিরাপদে থাকবে?

এটি একটি বিশ্বাস! যে কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, নবীকে গালি দেওয়ার বিরুদ্ধে কেমন অবস্থান এবং কি হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া! তিনি ছিলেন কারাগারের ভেতর বন্দী। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবারে নিরাপদে থাকাবস্থায়ও তাঁর গায়ে একটি কাঁটা বিধুক, এটাও আমি চাই না। এই ছিল তার বিশ্বাস! আমার সাথে আমার বিশ্বাসের বিষয়ে

দর কষাকষি করো না। আমি নিজেই দরজা বন্ধ করে দিবো। তবুও কারাগারে আমার আকিদা বিষয়ে আমার সাথে কথা বলো না।

এখন তোমার নিকট একটি দল এসে বলবেঃ "আমরা পারস্পরিক কল্যাণকামীতার জন্য যাই। "তারা আপনার নিকট এরকম ১৫ টি কল্যাণের দিক উল্লেখ করবে। একজন শায়খকে নিয়ে আসবে, যার সাথে থাকবে মানসিক ডাক্তার, সামাজিক ডাক্তার। তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসবে আপনি যদি তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসন্ধান করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেনঃ

তাদের একজন পাশ্চাত্যের, একজন প্রাচ্যের, আবার একজন মার্ক্সবাদী। কিন্তু সকলে আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ! একজন ব্রিটেনে প্রতিপালিত হয়েছে, একজন আমেরিকায়, আরেকজন জানা নেই, কোথায় প্রতিপালিত হয়েছে!একজনের উপাধি শায়খ ডক্টর', আরেক জনের উপাধি শায়খ 'আলিম' আরেকজন 'মনোবিজ্ঞানী', আরেকজন 'সরকারী ডাক্তার'! যেন এখন আমাদের বিশ্বাসই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে! কেননা আমরা শরয়ী শাসনের দিকে আহ্বান করি!

আমরা বলিঃ এখন আমরা আগ্রাসী শত্রুকে বহিষ্কার করবো। তারা এখন আমাদেরকে সরকারী ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে চায়। আপনাকে এসে বলবেঃ এই লোক মানসিক রোগী আসো, আমার নিকট দু'টি রেখা অংকন করো, আমি দেখবো, তোমার ভিতরগত সমস্যা কি? তোমার ভিতরটা বদ্ধ যেহেতু তুমি এই আদর্শ লালন করো, যেটার ভিতর বন্ধ্যাত্ব রয়েছে। তাই তারা তাদেরকে নিয়ে আসবে উপদেশের বিশাল সূচি নিয়ে। আর যুবকদেরকে উপস্থিত করবে।

"আমাকে বন্দীদশার মাধ্যমে শাস্তি দাও, আমাকে একটি কক্ষে রেখে তালা মেরে দাও, আমার উপর সব অবস্থা সংকীর্ণ করে দাও আমার নির্জনতায় এবং প্রতিটি স্থানে আমার জন্য ক্যামেরা সেট করো এবং আমার সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ করো তারপর কৃত্রিমভাবে বলাওঃ প্রশান্তির সাথে আমার দিকে আসো আমরা তোমার চিকিৎসার জন্য ৫ মিলিয়ন রিয়াল খরচ করবো। এরপর আলিমদেরকে নানা প্রশ্ন করো।"

তারা এ সমস্ত শায়খদেরকে নিয়ে এসেছে তোমার বিশ্বাস পরিবর্তন করার জন্য। সুবহানাল্লাহ! যেন এ সমস্ত আকিদা-বিশ্বাস ধারাবাহিক উত্তরাধিকার সূত্রে। পাওয়া কোন সম্পদ, তাদেরকে দিয়ে দিলাম, তো শেষ! আল্লাহর পানাহ! বিশ্বাস অবিচল একটি বিষয়। যাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসো।" যখন তোমরা এই দ্বীন, তথা জিহাদকে ছেড়ে দিবে, যার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে.. যখন তোমরা এটাকে ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন।

আমরা কিভাবে ফিরে আসবো? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে" এমন নয় যে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের বন্দীদশায় আমাদের দ্বীনকে বিলিয়ে দিবো এবং তাদের সাথে আদান-প্রদান করবো। আপনার কি ধারণা, যদি আপনার স্থানে মুহাম্মাদ ﷺ থাকতেন?!

কিছু কিছু লোক বলেঃ আরে ভাই, শুধু স্বাক্ষরটা করে বের হয়ে যান! তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখন আমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের মুক্তি পাওয়া। কেননা দাওয়াতের জন্য কোটি কোটি লোক আছে। আমাদেরকে মানুষের সামনে আমাদের পরিকল্পনাকে সফল করতে হবে। বিশেষ করে, আমেরিকা ও ইহুদী-খৃষ্টানদের সামনে কারণ তারা এই সূচি দেখে খুশি হয়।

তাই আমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো যুদ্ধের ময়দানে। যতক্ষণ আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবো, ততক্ষণ তারা কঠোর হতে থাকবে।

যতক্ষণ আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবো, ততক্ষণ তারা আমাদের কিছু লোককে বহিষ্কার করতে থাকবে। হে শায়খ নজদী! আপনি জাযীরাতুল আরবে পরিকল্পনা সাজান, আমাদের জন্য আপনার সকল উস্তাদ ও ছাত্রদেরকে একত্রিত করুন! সকলে মিলে আমাদেরকে একটি পরিকল্পনা দিন। আমরা কিভাবে এই চিন্তা দূর করতে পারি? কিভাবে এই চিন্তার চিকিৎসা করতে পারি? এরা এখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছে। আমেরিকার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে যাচ্ছে কেন? কারণ আমেরিকার পথ আনন্দময়। তার রয়েছে

সাদা কবুতর ও যাইতুনের পাতা। আর দুনিয়া হল সুস্বাদু আমরা কেন মানুষের সাথে সংঘাতে যাবো!?

তাই তোমরা তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করো। অতঃপর যখন তোমরা তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলবে তখন আমরা এসে ৫০ পথে পরিকল্পনা করবো। এবং তাকে ইহুদী-খৃষ্টানদের সামনে পেশ করবো এবং জিহাদি আকিদাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ইসলামী বিশ্বে একটি সংশোধন কর্মসূচি চালু করবো, তাই যখন সে তোমার নিকট আসে, তখন বলে স্বাক্ষর করে মুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ এখন বলছেঃ আমরা তোমার জন্য ৫ মিলিয়ন খরচ করবো। যা মূলতঃ ২ লক্ষ কিন্তু আমাদের মাঝে আর উক্ত দলের মাঝে আছে কিছু চেক তাদের একজন হল সালাফি, একজন সমাজবাদী, একজন আমেরিকান ডাক্তার। সমস্যা যৌথ এখন বন্দী অটল। তাদের সামনে তার আকিদা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। ধন্যবাদ! এখন তুমি কি চাও? তিনি তাদেরকে বলেননি যে, আমি একটি পত্র পাঠাতে চাই। না, আমার রয়েছে আকিদা, আমার রয়েছে ঈমান এখন হল নামায ও ইবাদতের সময়। তিনি বললেনঃ তোমরা আমাকে একটু সময় দাও, আমি দু'রাকাত নামায পড়বো

তিনি সর্বশেষে এই জিনিসটির মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চেয়েছেন। আল্লাহর জন্য দু'রাকাত নামায কারণ তিনি মূলতঃ এই ইবাদতের জন্যই এই দুনিয়াতে জীবন কাটিয়েছেন

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْۚ

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করতে চান না।"

নামায হল ঈমানের সর্বপ্রধান কাজ। এটাই হল দৃঢ়তা

وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ

"তোমরা সবর ও নামাযে মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো"।

এটাই হল সেই জিনিস।

এখন অবস্থা খুব ভয়ংকর। সকল কাফের ঐক্যবদ্ধ। এই সমাবেশ ঘটানো হয়েছে ত্রাস সৃষ্টির জন্য তারা বুঝতে পারেনি, আমার আকিদা এই সকল কথাবার্তাকে পরিবর্তন। করে দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

"সমস্ত মানুষও যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। তাহলে তারা তোমার তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে, যতটুকু আল্লাহ তোমার ব্যাপারে লিখে রেখেছেন।"

আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যতটুকু লিখে রেখেছেন, তারা তার চেয়ে বেশি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না অবশ্যই আমাদেরকে এই স্তরে পৌছতে হবে, যাতে আমরা ফেতনার মোকাবেলা করতে পারি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সন্তুষ্টির কাজ করতে পারি তাই তিনি রাদিআল্লাহু আনহু দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন। অতঃপর বললেনঃ

আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি একথা মনে না করতে যে, আমি ভয়ের কারণে নামায দীর্ঘ করেছি, তাহলে আমি অবশ্যই নামায আরো দীর্ঘ করতাম এটাই আমার চোখের শীতলতা। এটাই আমার পাথেয় যদি তোমাদের পক্ষ থেকে এই ধারণা করার সম্ভাবনা না থাকতো যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুসলিম মৃত্যুকে ভয় করছে। তাহলে আমি তা আরো দীর্ঘ করতাম এবং আল্লাহর সাথে কথা বলার স্বাদ লাভ করতাম এখন আমরা অধিকাংশ ইস্তেশহাদী ভাইদের অবস্থা এমন দেখি যেঃ

অভিযানের সময় হলে আপনি তাদের সাথে একটি কুরআন দেখতে পাবেন

আক্রমণ করার পূর্বে সে তার কুরআন থেকে হয়ত বারাআহ অথবা আনফাল পাঠ করছে।

চিন্তাধারা সিরিজ

১৩

শাহাদাতের ফযিলত

শাইখ যাকারিয়া (হামযাহ আল হাত্তার) রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৩

শাহাদাতের ফযিলত

শাইখ যাকারিয়া (হামযাহ আল হাত্তার) রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



এটা শাহাদাতের পথ। জান্নাতের সবচে’ সহজ পথ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, শহীদদের বাড়ি হল সবচে’ সুন্দর বাড়ি। তিনি সকল মুমিনদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু শহীদদের বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি দেখেননি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: জান্নাত তরবারির ছায়াতলে এবং জান্নাতের সবচে’ কাছাকাছি পথ হল আল্লাহর পথে যুদ্ধ। এটা সবচে’ শ্রেষ্ঠ আমল- যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদিসে এসেছে, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন:

نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ

“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানি, জিহাদ সর্বোত্তম আমল। তাহলে আমরা কি জিহাদ করবো না?” (সহীহ বুখারী)

সুতরাং সেই সকল লোকদের জন্য মোবারকবাদ, যারা এ পথে চলেছেন, এ ময়দানে বিচরণ করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের নিয়তে এ পথে অটল থেকেছেন। তথা জান্নাতের পথে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জান্নাতকে অপছন্দনীয় বিষয়াবলী দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

“তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।“ (সূরা আল-ইমরান ৩:১৪২)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা

ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।“ (সূরা বাকারা ২:২১৪)

আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা দিয়েছেন:

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

“আমি আমার রাসূলগণকে ও ঈমানদারগণকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনেও এবং যেদিন সমস্ত সাক্ষীগণ দাঁড়াবে, সেদিনও।“ [সুরা মু'মিন - ৪০:৫১]

সুতরাং যদি বিজয় না হয়, তবু সেটা দুই কল্যাণের একটি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

“আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।“ [সুরা তাওবা - ৯:৫২]

সুতরাং বল, তোমরা আমাদের ব্যাপারে যার অপেক্ষা করছো, তা তো দুই কল্যাণের কোন একটি ছাড়া আর কিছু নয়। হয়ত শাহাদাহ নয়ত বিজয় ও সফলতা।

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

“আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।” (সূরা বাকারা ২:১৫৪)

আমরা বুঝি না। শহীদগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত। এটা নিশ্চিত সংবাদ। আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ। রবের দেওয়া সংবাদ।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ- فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৬৯-১৭১)

শহীদগণ আল্লাহর মেহমানদারিতে থাকেন। বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হন। সহীহুল মুসলিমের মধ্যে এসেছে, "আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত-

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে: "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত" (সূরা আল ইমরানঃ ১৬৯)- তিনি বলেন, আমরা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- শহীদগণের রূহ সবুজ পাখির ন্যায় স্বাধীনভাবে জান্নাতে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত ফানুসের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে। একদা তাদের রূহসমূহ ঐ অবস্থায় থাকাকালে তোমার প্রতিপালক তাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমার নিকট চাও। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট আর কি চাবো! আমরা তো স্বাধীনভাবে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। তিনি তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করবেন। তারা যখন দেখলো যে, কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বললো, আমরা আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমাদের

দেহে আমাদের রূহ ফেরত দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাবেন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে পারি। আল্লাহ যখন দেখলেন যে, তারা এটাই চাচ্ছে, তখন তাদেরকে (স্ব স্ব অবস্থায়) ত্যাগ করা হলো।" [মুসলিম ১৮৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ২৮০১]

শহীদের কামনা হলো, তিনি আবার নিহত হওয়ার জন্য দুনিয়ায় ফিরে আসবেন চাইবেন।

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ".

"আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্র কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহ্র কাছে তার সওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবেনা। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযিলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহ্র পথে শহীদ হবার প্রতি আগ্রহী হবে।" (সহীহ বুখারী-২৭৯৫)

অতএব, কোন বান্দাই মৃত্যু বরণ করে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, চাই তাকে গোটা দুনিয়া ও তার উপর যত কিছু আছে সব দেওয়া হোক না কেন। শুধুমাত্র শহীদ ব্যতীত। তিনি ফিরে আসতে চাইবেন, শাহাদাতের মর্যাদা দেখার কারণে। শহীদের আখেরাতের সফরটা খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত সফর, যাতে কোন মৃত্যুর যন্ত্রণা নেই।

শহীদ পিপড়ার কামড়ের চেয়ে বেশি মৃত্যু যন্ত্রণা পাবে না। শহীদকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। সে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে। কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকে। কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। শহীদ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতে চলে যায়।

وَعَن أَنَسٍ رضي الله عنه:أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بنِ سُرَاقَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ

ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، فَقَالَ» :يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى .«رواه البخاري

"আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত-

উম্মে রুবাইয়ে' বিনতে বারা' যিনি হারেসাহ ইবনে সূরাকার মা, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেসাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে নিহত হয়েছিল। যদি সে জান্নাতি হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব।' তিনি বললেন, "হে হারেসার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।" (সহীহ বুখারী-২৮০৯)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের উদ্দেশ্যে তখন কী বলেছিলেন? যখন দুই কাতার মিলিত হল, তরবারিগুলো উঠানো হল, বর্ষা তুলে ধরা হল এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেল, তিনি কি বলেছিলেন, মুশরিকদের গর্দানগুলোর দিকে যাও? না। তিনি বলেছিলেন:

عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) يوم بدر (قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

"আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে (বদরাভিমুখে) রওনা দিলেন। পরিশেষে মুশরিকদের পূর্বেই তাঁরা বদর স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মুশরিকগণ সেখানে এসে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা অবশ্যই কেউ কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু করবে না; যতক্ষণ আমি নির্দেশ না দেব অথবা আমি স্বয়ং তা করব।" সুতরাং যখন মুশরিকরা নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তিনি বলেছিলেন: "তোমরা সেই জান্নাতের দিকে ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান।" বর্ণনাকারী বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" উমাইর বললেন, 'বাঃ বাঃ!' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "বাঃ বাঃ' শব্দ উচ্চারণ করার জন্য তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করল?" উমাইর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! তার (জান্নাতের) অধিবাসী হওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তিনি বললেন, "তুমি তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর তিনি কতিপয় খেজুর স্বীয় তূণীর থেকে বের ক'রে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'যদি আমি এগুলি খেতে থাকি, তবে দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকতে হবে (এত দেরী সহ্য হবে না)।' বিধায় তিনি তাঁর কাছে যত খেজুর ছিল, সব ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন।" (সহীহ মুসলিম ৫০২৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা সেই জান্নাতের দিকে ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান।" উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান?' বাহ, বাহ, কী চমৎকার! তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহ, বাহ, বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো? উমাইর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! বরং আল্লাহর কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরূপ বলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)। অতঃপর তিনি কতিপয় খেজুর স্বীয় তূণীর থেকে বের ক'রে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তাও হবে এক দীর্ঘ জীবন। তারপর তিনি তার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন তারপর জিহাদে প্রবৃত্ত হলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন।

উমায়র ইবনুল হুমাম কোথায়? জান্নাতে। হারেসা কোথায়? জান্নাতে। হারাম বিন মালহান যখন পিঠে বর্ষাঘাত প্রাপ্ত হলেন, তখন তার বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছিল, তিনি রক্ত প্রবাহমান অবস্থায় বললেন:

فزت ورب الكعبه

"কাবার রবের শপথ আমি সফল হয়ে গেছি।"

জনৈক সাহাবীর লাশ আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই মর্যাদার কারণেই, যা আল্লাহ শহীদগণকে দিয়েছেন।

জনৈক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি কাফের ছিলেন। বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি যুদ্ধ করবো? বললেন: ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধ কর। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: অল্প আমল করেছে, কিন্তু বেশি পুরস্কার পেয়েছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু. বলেন, তিনি নিহত হয়ে জান্নাতে চলে গেলেন, অথচ আল্লাহর জন্য এক রাকাত নামাযও পড়েননি।

আমর ইবনে সাবিত বলেন: কেউ সত্তর বছর নামায পড়তে পারে, সত্তর/আশি বছর রোজা রাখতে পারে। কিন্তু কেউ এই আত্মাকে আল্লাহর জন্য পেশ করবে, উৎসর্গ করবে, তা কেবলমাত্র সত্যিকার স্বচ্ছ মুমিনই পারে। সে নিজের মালিকানাধীন সবচে' বড় বিষয়টি উৎসর্গ করেছে। শুধু নামায বা শুধু রোজার মাধ্যমে উৎসর্গ করেনি। বরং সরাসরি নিজের আত্মার মাধ্যমে উৎসর্গ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। সে সরাসরি নিজের আত্মাকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেই নিজের আত্মাটা আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তাই তার জন্য মোবারকবাদ, যিনি নিজ আত্মাকে আল্লাহর জন্য বিক্রয় করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের থেকে আমাদের জানগুলোকে কিনতে চান। অথচ তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা আত- তাওবাহ ৯:১১১)

এটা হল ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অত:পর হত্যা করে ও নিহত হয়। এটা আল্লাহর সুনিশ্চিত ওয়াদা। যা আল্লাহ তায়ালা গুরুত্বারোপ করে বলেছেন। যা তওরাতে, ইঞ্জিলে ও কুরআনে আছে। আল্লাহর চেয়ে উত্তম ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করেছো, তার জন্য আনন্দিত হও। আর এটাই তো মহা সফলতা।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿﴾

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (১০) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। (১১) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে

দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১২) (সূরা আস-সফ ৬১:১০-১২)

সুতরাং দুনিয়া অতিক্রমের স্থান; স্থির হওয়ার স্থান নয়। দুনিয়ার জীবন হল এমন এক ভ্রমণকারীর ন্যায়, যে একটি গাছের ছায়ায় বসেছে, তারপর তা ত্যাগ করে পুনরায় ভ্রমণ শুরু করেছে।

****

চিন্তাধারা সিরিজ

মুসলিমের সম্মান এবং পূর্ববর্তীদের মর্যাদা

১৪

শাইখ আবু বাসির নাসির আল-ওয়াহাইশি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৪

মুসলিমের সম্মান এবং পূর্ববর্তীদের মর্যাদা

শাইখ আবু বাসির নাসির আল-ওয়াহাইশি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের উপর।

হে ভাইয়েরা! মুসলিম আল্লাহর নিকট অনেক বড় জিনিস। একারণেই শরীয়তে তার সম্মানকে মহান করে বিধান রাখা হয়েছে। তাই তো শরীয়ত মুসলিমের ব্যাপারে গীবত, চোগলখোরি ও গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করেছে। এছাড়াও আরো অনেক বিধান, যেগুলো এই মুসলিমের সম্মান রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে। হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ".

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ করা ব্যাপকতর সুদের অন্তর্ভুক্ত (মহাপাপ)। [সুনানে আবু দাউদ-৪৮৭৬]

অর্থাৎ সবচেয়ে বড় সুদ হল মুসলিমের ইজ্জতের ব্যাপারে জবানদারাজি করা। জনৈক গোলাম হাতিবের (হাতিব ইবনে আবি বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু) ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, হাতিবের ব্যাপারে অভিযোগ করতে। কিন্তু এই অভিযোগটি ছিল এক প্রকার জুলুম। যদিও হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষ থেকে এই গোলামের উপর জুলুম হয়েছিল।

কারণ সে গোলাম বলেছিল, "আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে বললেন: "তুমি মিথ্যা বলেছো। সে বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে"।

হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যদিও এই গোলামের উপর একটি জুলুম করে ভুল করেছেন, কিন্তু হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বদরে ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহর সঙ্গে সমস্ত জিহাদগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারিতে যুদ্ধ করেছেন। প্রথম দিনেই দাওয়াত

গ্রহণ করেছেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর উপর বেড়ে উঠেছেন, যৌবন লাভ করেছেন এবং পূর্ণ বয়সে পৌঁছেছেন।

তাই হতে পারে এই গোলাম ভুল করেছে বা তিনি এই গোলামের উপর অপরাধ করেছেন কিন্তু সে যখন রাসূলুল্লাহর নিকট অভিযোগ করতে আসল, তখন তিনি কী বললেন? বললেন: "তুমি মিথ্যা বলেছো। সে বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে"।

হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সেই বড় ভুলটি করেছিলেন, তথা রাসূলুল্লাহর গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন: "আমাকে বলুন। আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই"। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরের কথা খণ্ডন করে বললেন: "সে তো বদরে অংশগ্রহণ করেছে। হয়ত আল্লাহ বদরীদের অন্তরের ব্যাপারে জেনে নিয়েছেন। তাই তাদেরকে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"।

ভাইয়েরা! নেতৃবর্গ, উমারা, উলামা ও অগ্রবর্তীদের ব্যাপারে কথা বলা- চাই তারা ভুল করুক না কেন, তা অবশ্যই ইনসাফের সাথে হতে হবে। তাই এটা সঠিক হবে না যে, একজন লোক একটি ভুল করল, যার ফলে তার সকল ভাল কর্ম গুলো ভুলে যাওয়া হবে।

হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত গোলামের উপর জুলুম করার ক্ষেত্রে একটি ভুল করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তিনি কি হাতিবের ব্যাপারটিকে মিডিয়ার স্ক্রিনে প্রচার করেছিলেন? হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তো নবীজির গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তো সেটা কি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল?

যদিও তা একটি ভুল। একারণে আমাদের জন্য এটা জায়েয নয় যে, আমরা এই মুসলিমের বা এই মহান সাহাবীর ব্যাপারটি প্রচার করবো, যিনি রাসূলুল্লাহর সাথে সকল যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। সতর্ক করা হবে পরিমাণমত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "তোমরা মর্যাদাবানদের পদস্খলনগুলোকে গোপন রাখবে।"

একারণে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বে অনুগ্রহ পেয়েছেন, তারপর তিনি কোন ভুল করেছেন বা ভুল ইজতিহাদ করেছেন, অথবা ব্যাখ্যা করেছেন - একারণে বড়দের পূর্বে ছোটদের পক্ষ হতেই তাকে নিন্দা করা হবে- এটা জায়েয নয়। এটা সঠিক হবে না। সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ছোট বা নিচু লোকেরা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বা শায়খদেরকে খণ্ডন করবে, এটা সঠিক নয়। অর্থাৎ অযোগ্য ব্যাক্তিরা যোগ্য ব্যাক্তিদের ভুল ধরবে, তাদের রায়কে খণ্ডন করবে, এটা সঠিক নয়। এখানে ছোট বা নিচু লোক দ্বারা উদ্দেশ্য অযোগ্য ব্যাক্তি।

অতএব আমরা কারো ভুলকেই গ্রহণ করবো না। কিন্তু সাথে সাথে উলামা, উমারাহ ও মাশায়েখদের ব্যাপারে আদাব রক্ষা করবো। প্রত্যেক অবস্থায়ই আদব জরুরী এ সকল বড়দের সাথে, চাই তারা ভুল করুক না কেন।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, আপনি তার মর্যাদা রক্ষা করবেন। তার গোপন দোষসমূহ গোপন করবেন এবং তার ভুলগুলো ঢেকে রাখবেন। নিন্দা প্রচার করবেন না। ভুল এক বিষয়, আর নিন্দা প্রচার আরেক বিষয়। আহলে ইলমদের নিকট স্বীকৃত একটি মূলনীতি হল - জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। যতদিন আপনি এই পৃথিবীতে থাকেন, আপনি যেই হোন না কেন, নিন্দা প্রচারকারী বা যার নিন্দা প্রচার করা হচ্ছে, উভয়েরই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কে আছে নিরাপদ?

আপনি হয়তো অমুক জামাতের আমীরদের সমালোচনা এমনভাবে করেন যেন আপনার আমিরদেরকে আল্লাহ একেবারে নিরাপদ করে দিয়েছেন। তারা মনে হয় ভুল করেন না। নইলে কেন, যখন তাদের আমীরগণ ভুল করে, তখন তাদের ভুলগুলো গোপন করেন এবং তাদের বিষয়ে গোপনে কথা বলেন।

পক্ষান্তরে অন্যদের উমারাদের কি সম্মান বলতে কিছু নেই? এটা দ্বীনের ব্যাপারে এমন উদ্ভাবন, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। সুতরাং মর্যাদাবান, উলামা ও উমারাদের ব্যাপারে সমালোচনা হতে হবে আদাবের সাথে এবং বড়দের দিক থেকে। ছোটদের থেকে হতে পারবে না।

আপনারা দেখেছেন - অনেক সাহাবী নিজ ভাইয়ের গীবতের জবাব দিয়েছেন। নিজ ভাইয়ের ইজ্জতের পক্ষে জবাব দিয়েছেন। দেখুন কা’ব ইবনে মালিক

রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবুক যুদ্ধে যাননি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কা'ব ইবনে মালিক কোথায়?

তখন জনৈক আনসারী বললেন: তার পার্শ্বদেশ তাকে ফিরিয়ে রেখেছে। এই বলে তিনি নিজ বুকের কোমলতার স্থানটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহর শপথ! আমরা তার ব্যাপারে সর্বদা কল্যাণই জেনেছি"।

অর্থাৎ তিনি (মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু) গীবতের খণ্ডন করলেন। সেই স্থানে, যেখানে কা'ব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থেকেছেন। গাযওয়ায়ে তাবুক পরিত্যাগ করেছেন। এই সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পক্ষ থেকে গীবতের জবাব দিয়েছেন।

মানুষের সমালোচনা খুব স্পর্শকাতর বিষয়। আরো বেশি ভয়ংকর, যখন তা জ্ঞান ছাড়া হবে। ইনসাফ ছাড়া হবে। তখন সেটা জুলুম হবে। আর আরো বড় জুলুম হবে, যখন এটা অগ্রবর্তী, উলামা ও উমারাদের ব্যাপারে হবে। এটা মন্দ শিক্ষা এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ।

ছোট তালিবুল ইলমরা, ছোট মুজাহিদরা বা সাধারণ মুজাহিদরা বড় বড় উলামাদের ব্যাপারে সমালোচনামূলক কথা বলা অন্যায়। অথচ এই মুরুব্বিরা আল্লাহর পথে জিহাদের মধ্যে অনেক সময় পার করেছেন। কখনো কারাগারে কাটিয়েছেন। তারা ওই সময়ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, যখন আমরা পৃথিবীতে অস্তিত্বই লাভ করিনি। অর্থাৎ আমাদের জন্মলাভেরও পূর্বে।

তারা আল্লাহর পথে দীর্ঘ জিহাদ করেছেন। অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তারপর জনৈক ছোট বা নিচু প্রকৃতির লোক এসে এসকল আলেমদের ব্যাপারে সমালোচনা করা শুরু করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ভাইয়েরা, বিষয়টি বিপজ্জনক। অর্থাৎ আপনার কোন ভাইয়ের ব্যাপারে সমালোচনা করা। তাহলে যদি কোন আলেম বা এমন লোকের ব্যাপারে হয়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অগ্রগামীতা লাভ করেছেন, তাহলে কেমন হতে পারে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ "

"আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার সাহাবীদের তোমরা গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান-খাইরাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ বা অর্ধ মুদ দান-খাইরাতের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে না"। (সূনান আত তিরমিজী – ৩৮৬১)

এই ব্যক্তি এসকল বাহাদুর ও বীরদের ব্যাপারে কথা বলছে, যারা আল্লাহর পথে পরীক্ষিত হয়েছেন, ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। অত:পর আজ পর্যন্ত তার উপর অটল আছেন। তারপর জিহাদের নবাগত এক লোক এসে বড় বড় মুজাহিদিনের ব্যাপারে সমালোচনা করছেন। মুখভর্তি বড় বড় বিশাল বিশাল ফাতওয়া। সাহাবায়ে কেরামের বড় বড় ব্যক্তিগণ একে অপরের কাছে ফাতওয়া ঠেলে দিতেন। তাহলে আপনাদের অবস্থা কী?

মোটকথা, আল্লাহর নিকট মুসলিমের বিশেষ সম্মান আছে। একারণেই জিনার ক্ষেত্রে চারটি সাক্ষ্য লাগে, যারা সুরমাদানির মধ্যে কাঠি দেখেছে- যেমনটা উলামাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা দেখেছে এই পদ্ধতিতে, সকলে একসাথে। যদি তিনজন দেখে, হবে না। অথচ তারা তিনজন। আর এটা জিনার মত গুরুতর অপরাধ। বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ, জিনা। তিনজনে হবে না, চারজন একসাথে দেখছে, এমন লাগবে, যারা সুস্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দিবে। এটা এই মুসলিমের সম্মান হেফাজতের জন্যই।

তাই হে ভাইয়েরা, উলামা ও উমারাদের ব্যাপারে কথা বলা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। উলামা, উমারা ও বড়দের ব্যাপারে শ্রদ্ধা, সম্মান ও মূল্যায়ন রাখতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনিআরো বলেছেন:

“তোমরা আমার নেতৃবৃন্দকে আমার কাছে ছেড়ে দাও। তোমাদের উপর রয়েছে তাদের শাষণ করার ক্ষমতা, আর তাদের কাধে রয়েছে তোমাদের বোঝা।

মানুষের ব্যাপারে কথা অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে হতে হবে।

শায়খ আবু মুহাম্মদের একটি সুন্দর পুস্তিকায় এসেছে (আল্লাহ তাকে কারামুক্ত করুন), যার নাম হল- “ইনসাফ শ্রেষ্ঠদের অলংকার। আর শ্রেষ্ঠ লোক সর্বশ্রেণীর মধ্যে কম সংখ্যকই হয়”। খুব সুন্দর পুস্তিকা। অর্থাৎ আমাদের সর্বদা সেটার শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আর এমনটা হওয়া উচিত নয় যে, কেউ ভুল করলেই আমরা তার খণ্ডন করবো এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবো।

আমাদের সাথে আমাদের অনেক আফগান ভাইগণ ছিলেন, যারা কখনো আল কায়েদার সদস্য বা আল কায়েদার সাথে ছিলেন না। শায়খ আবু খালিদ আস-সুরী রহিমাহুল্লাহ কখনোই আ লকায়েদার সদস্য বা আল কায়েদার সাথী ছিলেন না। শায়খ আবুল ওয়ালিদ আল-ফিলিস্তিনী আল কায়েদার নন, শায়খ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী আল কায়েদার নন। আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি আল কায়েদার নন। এরকম আমাদের আরো অনেক ভাই ছিলেন।

আমরা তাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতাম। তাদের সম্মান করতাম, শ্রদ্ধা করতাম, মূল্যায়ন করতাম। তারা সর্বদা আমাদের সাথে ছিলেন। আমাদের মাঝে সেই সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, যেটা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। যদিও তাদের কারো কারো ব্যাপারে আমাদের কিছু আপত্তি ছিল। অর্থাৎ তাদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহণ করতাম না। কিন্তু আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতাম, তাদেরকে সম্মান করতাম। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতাম, তাদের জন্য দু'আ করতাম। মহান আল্লাহ জানেন, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমাদের বৈঠকগুলো সব সময় এদের সাথে হত। অথচ তারা কখনো আল কায়েদার মধ্যে ছিলেন না।

তাই এটা নিয়ম নয় যে, যেই আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমরা তার সকল পদস্খলনগুলো ক্ষমা করে দিবো আর যে-ই আমাদের বিরোধী মত পোষণ করবে, তার সকল ভালোগুলো শেষ করে দিবো। এটা মন্দ। আল্লাহর নিকট জুলুম থেকে, সর্ববৃহৎ জুলুম থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে জুলুম থেকে হেফাজত করুন। তিনি আমাদের গোপন বিষয়গুলো ঢেকে রাখুন, আমাদেরকে ভয়-আতঙ্ক থেকে নিরাপদ রাখুন। আমি আমার এই কথাটি আমার জন্য এবং সকল মুসলিমদের জন্য বলছি। আর আমার জন্য এবং সকল মুসলিমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

******

চিন্তাধারা সিরিজ

আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়

১৫

শাইখ নাসর আল-আনিসি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৫

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়

[সুরা আন‘আম - ৬:৫৫]

শাইখ নাসর আল-আনিসি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



বিপরীতমুখী দুটি পথ হচ্ছে: আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের পথ, আর অপরাধীদের পথ। যারা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা তারা মুমিনদের পথের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু অপরাধীদের পথের ব্যাপারে গাফেল থেকেছে। তারা কিভাবে মুমিনদের পথের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে আর অপরাধীদের পথের ব্যাপারে গাফেল থেকেছে? কিভাবে এটা হলো?

তারা ইবাদত, আনুগত্য ও তাওবার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত - এ ধরণের ইবাদতগুলোতে গুরুত্ব দিয়েছে। হৃদয় বিগলিতকারী বিষয়সমূহ এবং আল্লাহর ভালোবাসা ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। কিন্তু অপরাধীদের পথের বিষয়টি থেকে মুক্ত ছিল। সেটাকে অবহেলা করেছে, তা থেকে গাফেল থেকেছে। ফলে তার মাঝে কুফর ও তাগুতের ব্যাপারে যথেষ্ট বুঝ নেই। কাফেরদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়ার অর্থ কী? শরীক করার অর্থ কী? শিরকের অর্থ কী? তাগুত কী? - তারা এ বিষয়গুলো বুঝে নি। প্রাচীন জাহিলি যুগের মানুষগণ যে শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছিল, তার চিত্রগুলো কেমন ছিল?, কুরাইশের কাফেরদের শিরকটা কেমন ছিল?, তারা কেন কাফের ছিল? – ইত্যাদি বিষয়গুলোর বুঝ তাঁদের স্পষ্ট না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কি কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করেননি-

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ?" **[**সুরা লুকমান - ৩১:২৫**]**

তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হত - কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?, তবে তারা উত্তর দিত, 'আল্লাহ'। তারা বলত যে, 'আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা এবং আল্লাহই রিযিকদাতা'। তাহলে তাদের কুফরটা কী? তারা কিভাবে কাফের ছিল? অবশ্যই বুঝতে হবে যে, কেন কুরাইশের কাফেররা কাফের ছিল? কুফরের কারণটা কোথায় ছিল?

ইবলিস কিভাবে কাফের হল? ইবলিস আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিল, ফেরেশতাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু কাফের হয়ে গেল। কিভাবে কাফের হল?

কুফরের কারণগুলো কী? দ্বীন ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কী? ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কী? - তারা এসকল বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, কখনো দেখবেন, কিছু দায়ী, কিছু ওয়ায়েজ আল্লাহর ভালোবাসার ব্যাপারে আলোচনা করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার ব্যাপারে কথা বলে, নবীজির ইন্তেকালের বিষয়ে আলোচনা করে। আর বলতে বলতে তাদের ভিতরটা দু:খ ও ভয়ে ভরে যায়। কিন্তু হতবাক হয়ে দেখবেন, সে একটি কবর প্রদক্ষিণ করছে অথবা কোন কবরে সিজদাহ করছে বা কোন ওলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে!!

সুবহানাল্লাহ! কোথায় সেই ঈমান, যেটার ব্যাপারে আপনি কথা বলছিলেন? কোথায় আল্লাহর ভালোবাসা, কোথায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা?

তাই দেখবেন, তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন, কিন্তু কুফর ও তাগুতের মাসআলার প্রতি খেয়াল রাখা ব্যতীত। তারা শিরকী বিষয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এমন বিষয়সমূহে জড়াচ্ছে, যেগুলোর কারণেই কুরাইশের কাফেররা কাফের হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন এই কবরবাসীর নিকট সাহায্য চাচ্ছেন বা সেখানে তওয়াফ করছেন? তখন সে কী বলবে? বলবে, আমরা তার ইবাদত করি না, আমরা এগুলো করি, যেহেতু তারা পুণ্যবান। আর আমরা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবো।

ঠিক আছে তাহলে কুরাইশের কাফেরদের কুফরটা কেমন ছিল? তারা মূর্তি সম্পর্কে কী বলত? তারা বলত, “আমরা তো এগুলোর ইবাদত করি শুধু এজন্য যে, এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে”। কিন্তু আপনি এখন দাবি করছেন, আপনি মুমিন, মুসলিম, কিন্তু আপনিও এই কবরের অধিবাসীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হল, তারা মুমিনদের পথের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু অপরাধীদের পথের ব্যাপারে গাফেল থেকেছেন।

চিন্তাধারা সিরিজ

১৬

ভ্রাতৃত্ববোধ

শায়খ কাসিম আর-রিমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৬

ভ্রাতৃত্ববোধ

শাইখ কাসিম আর রিমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



শাইখ কাসিম আর রিমি রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আমাদের কোন কোন ভাইয়ের থেকে কখনো তার অজান্তেই কিছু অনুচিত কাজ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এসকল অনুচিত কাজের অন্যতম একটি হলো - ভ্রাতৃত্ববোধের অবমূল্যায়ন। যেমন; দুই ভাইয়ের মাঝে কোন এক বিষয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তখন এক ভাই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে, 'কাজের জায়গায় কাজ আর ভ্রাতৃত্বের জায়গায় ভ্রাতৃত্ব। এই দুটি ভিন্ন জিনিস'।

অথচ তার এই বক্তব্য কোরআনের এই আয়াতের বিপরীত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

"অর্থঃ তিনিই আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে"। (সূরা আনফাল ৮:৬২)

আপনি দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ তায়ালা এখানে তাঁর সাহায্যের সাথে মুমিনদেরকে যুক্ত করেছেন। আল্লাহ যেন বলছেন, নিশ্চয়ই মুসলিমদের বিজয় এবং শক্তি – তাদের মুমিন ভাইদের মাধ্যমেই অর্জিত হবে।

জাযিরাতুল আরবে জিহাদের ময়দানে শয়তান আমাদের তাওহীদের পতাকার মাঝে ফাটল ধরানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাওহীদবাদীদের ঐক্যের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তেই সে সফল হতে পারেনি। এখানে তাওহীদের অনুসারীদের দেখতে হবে যে, ঐক্যের মূলমন্ত্র কী? জাতীয়তাবাদের পতাকা না তাওহীদের পতাকা? জাতীয়তাবাদের পতাকা কখনোই ঐক্য ধরে রাখতে পারে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মসজিদের মাধ্যমে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

আমাদের একজন সম্মানিত, একনিষ্ঠ মুসলিম ভাই তার কাজকে সঠিক মনে করে অন্য ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন যে, "ভাই! ভ্রাতৃত্ববোধ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে আমি এই নীতি গ্রহণ করবো যে, ভ্রাতৃত্ববোধ এক জিনিস আর কাজ আরেক জিনিস। দুটির ক্ষেত্রে আচরণ ভিন্ন হবে"।

কিন্তু আমি বলবো: "হে ভাই! আপনি এ কথা বলবেন না যে, আমাদের কাজগুলো এই নীতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন: "তোমরা দুজন একে অন্যকে মেনে চল, পরস্পর বিরোধ করো না"।

তাই আমরা সকলেই আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং নিজেদের মধ্যে ছাড় দেয়ার মানসিকতা লালন করবো। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের উপর অটল থাকবো। এই সকল বিষয় আমরা সকলেই পালন করবো ইনশাআল্লাহ।

এসব সমস্যার মূল কারণ - পশ্চিমা বিশ্ব-ব্যবস্থা। এই পশ্চিমারা আমাদের অজান্তেই আমাদের মাঝে এই শিক্ষা বিস্তার করে দিয়েছে যে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক মূলনীতি অনুসরণ করে চলবো। অথচ এই মূলনীতি অনেক আগেই তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। তাই এখন অনেকেই এই মূলনীতি থেকে ফিরে আসছে।

এখন আপনি যদি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলেন এবং তার সাথে লেনদেন করেন, তবে সে আপনার থেকে এমনিতেই দূরে সরে যাবে। অথচ উচিত হলো- আপনার এই ভাইকে ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

আপনি হয়তো বিশুদ্ধ নিয়তে এই নীতি গ্রহণ করেছেন যে- ভ্রাতৃত্ববোধ এক জিনিস আর কাজ করা আরেক জিনিস। এই নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়তো আপনার মূল লক্ষ্য ছিল - দ্বীনি কাজগুলো সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া। কিন্তু বাস্তবে এধরণের কথা বলার দ্বারা পরস্পর রূঢ় আচরণের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা আনসারদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণনীতি দেখতে পারি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আনসারদের ভালো কাজগুলো গ্রহণ করা হবে আর তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

ছোটদের স্নেহ করা এবং বড়দের ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের ছোটখাটো পদস্খলনগুলো এড়িয়ে চল।"

এই বিষয়টি আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো মুচকি হেঁসে শাস্তি দিতেন। তাই আমি (শাইখ রিমি রহিমাহুল্লাহ) রাগান্বিত অবস্থায়ও রাসূলের মুচকি হাঁসির কথা ভুলিনি।

সুতরাং আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। কেননা আমরা ইসলামের ধারক-বাহক।

আচ্ছা, আমরা এই দাওয়াতি কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করবো?

মূলত দাওয়াতি কার্যক্রম একটি আন্দোলন। এটাকে আমরা প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিবো। যেমনভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দাওয়াত মানুষের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন, আমরাও ঠিক তেমনভাবে সকল মানুষের মাঝে এই দাওয়াত ছড়িয়ে দিবো ইনশাআল্লাহ।

কখনো একজন লোক এসে আপনাকে বলবে, "আপনার সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দান করুন, যাতে আমি এই সম্পদের মাধ্যমে শাসকের দাম্ভিকতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি"। কিন্তু পরবর্তীতে সে শাসকের দাম্ভিকতা চূর্ণ করার কোন চেষ্টাই করেনি। তাহলে কি হলো? এটা হচ্ছে কাজ না করে শুধু শুধু প্রতিক্রিয়া দেখানো।

এই ধরণের বিভিন্ন পরিস্থিতি আসতে থাকবে। কিন্তু আপনি নিজেকে ধৈর্যের জন্য প্রস্তুত করুন। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যান।

একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই আরবরা শক্তিশালী হবে - যদিও আরবরা তা অস্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে, তারা শুধু ইসলামের মাধ্যমেই শক্তিশালী হতে পারবে।

কেউ কেউ আপনাকে বলবে যে, 'আগুনে ঝাপ দিতে পারি কিন্তু লাঞ্ছনাকে মেনে নিতে পারবো না'। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে, 'আমরা আগুন সহ্য করতে পারি কিন্তু লাঞ্ছনাকে বরদাস্ত করতে পারিনা'।

একমাত্র ইসলামই আরবদের উপকারে আসবে। ইসলাম ছাড়া কোন মূলনীতিই মানুষের কোন কাজে আসবে না। তাই আমাদের সকলের কর্তব্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করা।

চিন্তাধারা সিরিজ

প্রতিরোধের সুন্নাহ

১৭

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৭

প্রতিরোধের সুন্নাহ

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



প্রতিরোধের সুন্নাহ (পথ ও পন্থা) কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে এটা আমরা আমাদের প্রথম বিজয়ের সময় এবং এরপরের বিপর্যয়ের সময় সরাসরি বুঝতে পেরেছি। যা সর্বজনবিদিত।

না, আমি বিজয়ী হবো। অর্থাৎ: শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করবো এবং বিজয়ী হবো। এভাবে চলতে থাকবে।

এই সুন্নাহ-ই চলমান। এই সবকিছুই বিজয়। তাই প্রতিরোধের এই সুন্নাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব ভূখণ্ডে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পর - যখন আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন তখন কতিপয় আরব আবার মুরতাদ হয়ে গেল।

يبدأ الجهاد من جديد + وتبدأ العبودية من جديد

জিহাদের দামামা নতুন করে বেজে উঠেছে এবং আল্লাহর দাসত্ব নতুন করে শুরু হচ্ছে।

আমি কীভাবে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করবো? মানুষকে কীভাবে তাদের দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনবো? বিষয়গুলো কীভাবে হবে?

আমার কাছে কিছু নাই তারপরও বিজয় আসবেই এবং বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে যেমন পূর্বে ছিল।

তুমি কী (এই কাজের দাসত্ব) করতে পারবে না?, এটাই আল্লাহর দাসত্ব। আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু তোমাকে বিজয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন, আবার বিপদ দিয়েও পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

"আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি পরীক্ষা করার জন্য" (সুরা আম্বিয়া ২১:৩৫)

তোমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা করা হবে।

অতঃপর, অবশ্যই আল্লাহ দেখে নিবেন। কখনো তুমি বিপদে ধৈর্যধারণ কর আবার কখনো স্বাচ্ছন্দ্যের সময় ধৈর্যধারণ করো না। কখনো কখনো এর বিপরীত হয়। সারকথা, তাই আমরা বলি - প্রতিরোধের এই পদ্ধতি কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" (সূরা হজ্জ ২২:৪০)

****

চিন্তাধারা সিরিজ

১৮

আমলের রূহ

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৮

আমলের রূহ

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



প্রতিটি আমল তথা কাজের একটি রূহ এবং দেহ রয়েছে। চাই এটা সামরিক কাজ হোক অথবা নিরাপত্তা বিষয়ক হোক বা তথ্যসংক্রান্ত হোক। বনী আদমের দেহ যেমন রয়েছে, তেমনি রূহও রয়েছে। তো এই দু'টির মধ্যে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ? রূহ না দেহ?

কোন সন্দেহ নেই যে, রূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটা কিছু তো এই দেহকে গঠন করছে এবং পরিচালনা করছে। তাই না?

কিন্তু রূহ কোথায় আছে? (দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না অথচ) তার সাহায্যেই জীবন চলে।

তো রূহ হলো সেই 'মূল' তথা মানুষ যেই জিনিসের মাধ্যমে সহায়তা চায়। আর যার পা নেই, হাত নেই, চোখ নেই কিন্তু রূহ আছে - সে নিজে চলতে পারে, বসবাস করতে পারে, হাঁটতে পারে যদিও তার দৈহিক গঠনে কোন ত্রুটি আছে। পক্ষান্তরে যদি তার দৈহিক গঠন ১০০% ঠিক হয় কিন্তু রূহ না থাকে – তবে সেটা একটা প্রাণহীন দেহ। তার এ দেহ তিন-চার দিনেই নষ্ট হয়ে যাবে। পোকা-মাকড় তা খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু যদি প্রাণ থাকে, পাশাপাশি দৈহিক গঠনে ত্রুটিও থাকে - তবে সে চলতে পারে, থাকতে পারে। আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো রূহ, দেহ নয়। যদিও শরীর গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক গঠনে ত্রুটি হতে পারে। রূহের মধ্যে ত্রুটি হয় না।

আর আল্লাহ তায়ালার হিকমাহ হলো **روح العمل** তথা কাজের রূহকে সহজ করেছেন। হতে পারে কাজটা কঠিন। এখন প্রশ্ন হলো, কাজের রূহ কী?

কাজের রূহের অনেক রূপ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো - আপনার হতোদ্যম কোন এক ভাই আপনার কাছে আসবে। সে খাচ্ছে, পান করছে, চলছে - কিন্তু সে হতোদ্যম ও হতাশ অবস্থায় আছে। ফলে আপনি তাকে একটি কালিমা উপহার দিবেন। যেমন:

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

"যে ব্যক্তি একটি প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষকে রক্ষা করলো।" (সুরা মায়েদা ৫:৩২)

অথবা,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, (মক্কার লোকেরা) তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৭৩)

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

“অতঃপর মুসলমানরা ফিরে এল আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৭৪)

এগুলো হলো **روح العمل** তথা আমলের রূহ। আপনি আপনার মৃত্যুমুখে পতিত (হতাশ) ভাইয়ের কাছে আসলেন - যে অস্ত্র ফেলে দিয়েছে, পর্যদুস্ত হয়েছে। তখন তাকে দু’টি কালিমা বা তিনটি কালিমা উপহার দিলেন। সে আবার উদ্দমতা ফিরে পেল। এটাই হলো **روح العمل** তথা আমলের রূহ।

এক্ষেত্রে আপনি প্রজ্ঞাবান আল্লাহর দিকে লক্ষ্য করুন। তিনি এই রূহের প্রতি কেমন গুরুত্ব দিয়েছেন! আল্লাহ তা’য়ালা যখন সাহাবীদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে ফেরেশতা যমীনে নেমে তাদেরকে সাহায্য করবেন, তখন আয়াতের শেষাংশে তিনি বলেন:

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে

না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী হেকমত ওয়ালা।" (সূরা আনফাল ৮:১০)

সুতরাং সুসংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিলো ঈমান বৃদ্ধি করা। এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি আপনার আস্থা বেড়ে যাবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস বাড়বে।

তো আপনি লক্ষ্য করুন যে, কুরআনের এসকল আয়াত ঈমানের স্তর উন্নীত করে মনোবল বাড়িয়ে দেয় এবং আপনার জন্য নতুন জীবন ফিরিয়ে আনে। বিপরীতে লক্ষ্য করুন - ঐ আত্মার দিকে যা তার রূহকে নিচে নামিয়ে দেয়। (আর এই আত্মা যা রূহকে নিচে নামিয়ে দেয়) তা আপনাকে বলবে, আল্লাহর কসম হে ভাই!....সবই ঠিক আছে হে ভাই!

তার কথা কিন্তু কখনো কখনো সহিহ হয় তারপরও কিছু সমস্যা? তা হলো সে কোন কিছু বুঝা ছাড়াই নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ: আপনার সামনে একটি সিংহ একটি মোরগকে ছিড়ে-ফুরে খাচ্ছে। কিন্তু তাতে আপনার কিছুই মনে হচ্ছে না, কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কী কারণে আপনি কিছুই করতে পারছেন না? কারণ আপনার রূহ নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবেমাত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। গোত্রগুলো মুরতাদ হওয়া শুরু করলো। একথা শুনে এক সাহাবী তরবারী উঁচু করে বললেন:

من قال أن محمدا قد مات فقد نافق يقطع رقبته

"যে বলবে: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মারা গেছে, সে মুনাফেক হয়ে গেছে। তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে"।

এই অবস্থাটা খুব কঠিন ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সংবাদ কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে সাহাবীদেরকে নতুন জীবন দান করলেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু চমৎকার কিছু কথা বলেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর প্রসঙ্গে তিনি বললেন: আমরা শিয়ালের মত ছিলাম (এমন শিয়াল সে উদ্দেশ্যহীনভাবে এভাবে-সেভাবে হাঁটে) আর আবু বকর

রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েই গেলেন, যার ফলে আমরা সিংহের মত হয়ে গেছি। তিনিই আমানত ও মানুষের হক রক্ষা করেছেন।

আপনার উপর আবশ্যক হলো - এই সংকটকালে যা কিছুই হোক না কেন - আপনি অবিচল থাকবেন। আপনি ছোট বাচ্চাদের দিকে লক্ষ্য করুন। তারা যখন বাবাকে রাগান্বিত বা বিহ্বল দেখে তখন তারা ভয় পায়, কাঁদে। আর যখন বাবাকে স্থির দেখে, তখন চুপ হয়ে যায়। এটাই হলো রূহ, এটাই হল আত্মার অবস্থা।

আমাদের নিকট অন্য একটি রূহ আছে তা হল- ভ্রাতৃত্ব। আমার উপর, আপনার উপর আবশ্যক হলো- নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী করা। আমরা আমাদের মাঝে এবং ভাইদের প্রতি এই ভ্রাতৃত্ববোধ লালন করবো।

যখন ভ্রাতৃত্ব না থাকে তখন প্রত্যেকে অন্যের উপর কাজ চাপিয়ে দেয়। একজন ভুল করলে কেউ তাকে ক্ষমা করে না। আর যদি কেউ ভুলবশত কোন কাজ করে ফেলে তখন কেউ তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। আপনি ইসলামের দিকে লক্ষ্য করুন- কীভাবে ইসলাম ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। ভ্রাতৃত্ব তো বিরাট একটি বিষয়।

[আলোচনার এই স্থানে ইটের ছবি দেখানো হয়েছে]

উপরের ইটগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন, কীভাবে একটা আরেকটার সাথে মিলে আছে। এই ইটটি শুধু ঐ একটি ইটের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং প্রতিটি ইট অপর দুইটি ইটের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। তাদের মাঝে রয়েছে ভ্রাতৃত্ব মিল। আর এটাই হলো روح العمل তথা আমলের রূহ।

তবে আমরা যদি একটি ইটের উপর থেকে আরেকটি ইট কমিয়ে ফেলি তখন আপনি মিল ও সংযুক্ততার বিষয়টি বুঝতে পারবেন এবং এগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা জোড়া লাগাতে পারবেন। তখন তাতে মজবুত মিল বা বন্ধন পয়দা হবে। কেমন মজবুত বন্ধন? এর উত্তর নিচের হাদিসে রয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার আঙ্গুলগুলোর মাঝে জট পাকালেন তথা এগুলোকে একত্রিত করে দেখালেন যে, এটাই হলো ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। আর এটাকেই বলা হয়- **روح الأخوة** অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বের রূহ।

যখন কারো থেকে কোন ভুল দেখা যাবে, তখন তার ভুলগুলোর আলোচনা করবেন না - যা বলার দ্বারা আপনি স্বাদ পান। আপনার কোন ভাই ভুল করলে আপনি ভুলকে গোপন রাখবেন এবং তাকে সহযোগিতা করবেন। এই সহযোগিতার মাধ্যমে আপনি ভ্রাতৃত্বের স্বাদ পাবেন। আর এই স্বাদ কখন পাবেন? যখন আপনাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্বের নামই روح العمل তথা আমলের রূহ।

روح العمل তথা আমলের রূহ হলো একে অপরকে কল্যাণ ও তাকওয়ার উপর সহযোগিতা করা। আমরা একে অন্যকে সহযোগিতা করব। আমি আপনাকে আর আপনি আমাকে। আর এটা তো আপনার জন্য অনেক সহজ। এর দ্বারা আপনি আপনার কাজে সফল হবেন। ভাই! আপনার দোষ গোপন করে আপনাকে সাহায্য করাটাই আমার জন্য আনন্দদায়ক। এটাই আপনার জন্য হাদিয়া।

তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خيرله من أن يعتكف في مسجدي هذا

"তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজনে ছুটে যাওয়া তার জন্য অধিক উত্তম আমার মসজিদে ই'তিকাফ করার চেয়ে। [১]

এই কথা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এবং তাঁর মসজিদে বলেছেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদত আমাদের মত নয়। ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া তাঁর কাছে অধিক

---

[১] উক্ত হাদিসটি এই শব্দে খুজে পাওয়া যায়নি, তাই এই মর্মের একটি সহিহ হাদিস নিম্মে উল্লেখ করছি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমর (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। (বুখারী-হাদিস নং ৬৯৫১) – অনুবাদক

প্রিয়। এই সাহায্য এমন হতে পারে যে, তাকে ছাগল ক্রয় করে দেয়া বা অন্যকিছু ক্রয় করার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করা। এটা তো পরিস্কার দুনিয়াবি বিষয়। আর আল্লাহর রাসুল যে কাজের চাইতে উত্তম বলেছেন সেটি হচ্ছে ইতিকাফ।

চলা-ফেরার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার থেকে কী চাচ্ছেন সে উদ্দেশ্যটা বুঝে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন এই সময় বা এই মুহুর্তে আপনার জন্য ফরজ হলো, ভাইয়ের সেবা করা।

এমনিভাবে কাজের ক্ষেত্রেও আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন। আমি যে কোন একটা কাজের দায়িত্বশীল হতে পারি। আমি হয়তো আমার কোন কাজে যাচ্ছি। তখন হয়তো দেখলাম যে, এক ভাই তার পরিবার নিয়ে হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটাই আল্লাহ আমার থেকে চাচ্ছেন। তার চিকিৎসা করা ও তার পাশে থাকাই হলো ভ্রাতৃত্বের দাবী। আর ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা তো বিরাট এক কাজ।

লক্ষ্য করুন আল্লাহ তা'য়ালার কথার দিকে, কীভাবে তিনি পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি শরীয়ত প্রণেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আপনাকে এবিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন।

আপনি এমনভাবে কথা বলবেন না যাতে করে আপনার ভাইরা আপনার থেকে দূরে সড়ে যায়। এটা তো ভ্রাতৃত্ব নয়। স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ভাই আপনাকে খুব কম জিনিসই বলবে। কিন্তু আপনি নিজেই তার কাছে যান, তার সাথে কথা বলুন। তাকে বলুন যে, আপনি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন। আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের সকলকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আপনি আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত প্রকাশ্যে করবেন। এগুলো কেন?

পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বীজ বপন করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,

{ تَهَادُوْا تَحَابُّوا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي " اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ "

তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও একে অপরকে ভালোবাসো। (আল-আদাবুল মুফরাদ-৫৯৪)

অর্থাৎ ভালোবাসাটাই হলো মূল শরয়ী উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনবে। তোমরা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একে অপরকে ভালোবাসবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ-৬৮ সহিহ)

সুতরাং আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি অন্য কারো জন্য নয়। আপনাকে এমন একটি উপহার দিতে চাই যার ফলে আপনি আমাকে মুহাব্বাত করবেন আমিও আপনাকে মুহাব্বাত করবো।

ভ্রাতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তা অনেক ঝুঁকি, বিপদকে নিঃশেষ করে দেয়। কীভাবে মুহাব্বাত সৃষ্টি হবে তার পদ্ধতি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

"আমি কি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু দেখিয়ে দিবো না যা করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা তৈরী হবে তা হলো: তোমরা তোমাদের মাঝে সালাম প্রচার কর।" (সুনানে ইবনে মাজাহ-৬৮ সহিহ)

আপনি কারো আমীর বা দায়িত্বশীল, তখন আপনি তার সমীপে চিঠি লিখবেন এভাবে, "আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ! (আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!) আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আপনার শরীর-স্বাস্থ কেমন আছে?" এই মর্মে তার সমীপে একটা চিঠি পাঠাবেন। এতটুকু আপনার জন্য যথেষ্ট।

হযরত মু'আবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূলের এই হাদীস শুনলেন,

من احتجب عن الرعية احتجب الله عنه

"যে ব্যক্তি প্রজাদের থেকে আড়াল হয়ে যাবে আল্লাহও তার থেকে আড়াল হয়ে যাবেন।" [২]

তখন তিনি প্রজাদের জুলুম অন্যায়ের বিষয়গুলো দেখার জন্য একজনকে নির্ধারণ করলেন। যাতে তিনি প্রজাদের সাথে দেখা করতে পারেন। কারণ সকলে তো তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে না।

আজ আমি সকল ভাইদেরকে এই ওসিয়ত করছি। হে ভাইয়েরা! আপনারা সকলে নিজ নিজ এলাকার সামরিক দায়িত্বশীল, হক্ব জামা'আতের আদর্শ। যা আপনার অধীনে রয়েছে বা (আপনার অধিনস্ত) এক বা দু'জন ভাইয়ের অধীনে রয়েছে। আর এভাবে ওই জামা'আতটা আমাদের সকলের জিম্মায় রয়েছে। তো লক্ষ করুন **روح العمل** বা আমলের রূহ কেমন গুরুত্বপূর্ণ।

আর যে কাজের মধ্যে রূহ নেই তার কোন মূল্য নেই। **روح** এর অনেক অর্থ রয়েছে।

ইনশা আল্লাহ সামনে আমি **واجبات العمل و واجبات الجماعة** এর শিরোনামে তার আলোচনা করবো।

---

২ উক্ত হাদিসটি এই শব্দে খুঁজে পাইনি, তাই এই মর্মের আরেকটি হাদিস নিম্মে পেশ করছি

مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

"মহান আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে মুসলিমদের কোন দায়িত্বে নিয়োগ করলে যদি সে তাদের প্রয়োজন পূরণ ও অভাবের সময় দূরে আড়ালে থাকে তখন মহান আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব-অনটন দূর করা হতে দূরে থাকবেন"। (সুনানে আবু দাউদ ২৯৪৮) – অনুবাদক

চিন্তাধারা সিরিজ

সবরের মাধ্যমে জিহাদ

১৯

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ১৯

সবরের মাধ্যমে জিহাদ

শাইখ কাসিম আর রীমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



আমি ভাইদেরকে সম্বোধন করে বলছি যে, যখন তারা ছয় মাসের জন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়, অর্থাৎ ছয় মাসের জন্য এমন স্থানে গমন করে যেখানে তাদের গ্রহণ করার জন্য কোন ব্যক্তি নেই, তখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তবুও কাজ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। তখন কি কাজ বন্ধ করে রাখবে?

না, এটা করা ঠিক হবে না, বরং নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবে। সেখানেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সেখানে বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন।

একটু ভেবে দেখুন – মনে করুন কোন একজন ভাই মা'আরিব থেকে আবিয়ান যেতে চায় এবং তার সফরের সার্বিক অবস্থার উপর ভাল দক্ষতা আছে। সেক্ষেত্রেও তাকে কি পরিমাণ নিয়মনীতি মেনে চলতে হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা!

আল্লাহর কসম! কখনো কখনো এভাবে সাত, আট, নয় মাস হয়ে যায় কিন্তু কোন কাজের তারতিব হয় না। যে আদন - আবিয়ান (ইয়েমেনের দুটি শহর) গিয়েছে, সে সাত মাসেও সেখান থেকে আসতে পারেনি। মাঝে অনেক কিছু ঘটে যায়।

সুতরাং দেখা যায় আপনি ছয়, সাত, আট মাস পর্যন্ত সফর করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিন্তু সুযোগ হচ্ছেনা। হ্যাঁ, এমন পরিস্থিতিতে আমরা সুযোগের অপেক্ষা করবো, আর সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকবো।

একবার একজন ভাই দু'সপ্তাহ বিলম্ব করেছে। আরেক ভাই এগারো দিন বিলম্ব করেছে। তারপর এগারো দিন বিলম্ব করা ভাই আমাকে বলছে; কিভাবে এই ভাই দুই সপ্তাহ বিলম্ব করেছে!, এখন আমি কী করবো?

আমি বললাম: কি সমস্যা ভাই! এভাবেই কাজ করতে হবে। যদি এভাবে না করতে পারি, তাহলে তো এমন হতে হবে যে, আমি সফরে যাব, আমার জন্য গাড়ী অপেক্ষা করবে। আমি চিঠি পাঠাবো আমীর সাহেব আমার চিঠির উত্তর দিতে কলম নিয়ে বসে যাবেন। উত্তর আসতে দেরি হতে পারবে না। এবং এই চিঠি কোন বিশেষ দূতের নিকট পাঠাতে হবে, যে খুব দ্রুত পৌঁছে দিবে।

এগুলো কোনটিই সিস্টেম নয়। কোন জামাতের কাজ এমন হয় না। বরং আমি বলব, এগুলো একটা খেল-তামাশা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ রহম করুন, বিষয়টি কি এমন নয়?

ভাই! সকল বিষয়ে স্থিরতা প্রয়োজন। স্থিরতা দেখে মনে হবে জিহাদে থেকেও তিনি তার বাসস্থানে আছেন। এক্ষেত্রে খালেদ আল উসাইবীর কথাটি খুব চমৎকার; তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, 'কাফেরদের সাথে জিহাদ কিভাবে করবে'?

উত্তরে তিনি বললেন: 'সবরের মাধ্যমে'। অর্থাৎ যদি আমরা তাদের সাথে ই'দাদ, কিতালের মাধ্যমে জিহাদ করতে না পারি, তাহলে অবশ্যই তাদের সাথে সবর ও বিদ্বেষের মাধ্যমে জিহাদ করবো।

আল্লাহর কসম! এ থেকে বুঝা যায় লড়াই মানে কী! লড়াই মানে হলো একজন ভাইয়ের কাছে একটি বন্দুক আছে, তার সামনে শত্রুও আছে, ব্যাস এটাই লড়াইয়ের ক্ষেত্র। এরপর হয়তো শত্রু আমাকে হত্যা করবে অথবা তাকে হত্যা করে দিবো।

চিন্তাধারা সিরিজ

সর্বোত্তম ই'দাদ বা প্রস্তুতি

২০

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২০

সর্বোত্তম ই'দাদ বা প্রস্তুতি

শায়খ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



শাইখ দ্বিতীয় বারে বলেন, “উত্তম ই’দাদ কী?”

তার পরিচয় দিয়ে তিনি (আবু খালেদ আল উসাইরী) বলেন: “এখন আমি আপনাদের সামনে একটি উক্তি পাঠ করছি। সেটা হল, “সর্বোত্তম ই’দাদ হলো - আপনি শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে নেক আমল করবেন। যেমন: সাদাকাহ, রোযা, অন্যের থেকে অন্যায়ভাবে নেয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মুখলিছ ব্যক্তির দোয়া নেয়া, সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি।”

অর্থাৎ যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে বেশি পরিমাণে নেক আমল আগে প্রেরণ করবে।

তো আমাদের আলোচনা হল কিতাল সম্পর্কে। অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে আপনি কোন নেক আমল করবেন। যেমন: সাদাকাহ, রোযা, কোরআন তেলাওয়াত, ক্বিয়ামুল লাইল, অন্যের নেয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেটি যা আমি বিতর্কিত ভাইদের সাথে থাকাকালীন সময়কার অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি সেটা হল - তাদের একজন আমীরের সাথে ভাইদের কোন সম্পর্ক নেই। সেই আমীর ভাই দেখাশুনাও করেন না। তাদের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণও করেন না। এটা খুব একটা ভালো কাজ নয়।

সুতরাং, অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে অপরিহার্য হলো - সবার থেকে বলে যাওয়া। তাদের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে, তারপর বের হবে। অর্থাৎ, পিছনে বিপদজনক কোন বিষয় রেখে যাওয়া যাবে না যার কারণে শত্রুর সামনে উপস্থিত হবার পর অপদস্ত হতে হয়। অর্থাৎ যা পরে আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন বিষয়গুলোর মীমাংসা আগেই করে যেতে হবে।

এসকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। তারপর তাঁর উপর তাওয়াকুল করুন। কোন এক যুদ্ধে সাহাবাদের জন্য যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র মেসওয়াকের আমলে ক্রটির কারণে। অর্থাৎ একটি সুন্নত ছেড়ে দেয়ার কারণে। খুবই সম্ভব যে, এপরিস্থিতির শিকার আপনিও হবেন - কোন খুঁত বা কোন বিষয়ে অবহেলা করার কারণে। সুতরাং এই অন্যায় বা অবহেলা ইত্যাদির কারণে তখন আপনার কী অবস্থা হবে!!

এমনকি অনেক আহলে ইলেমগণ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে কোন নেক আমল করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। আমার মনে হয় কেউ কেউ বিষয়টিকে আলাদা বাব বা অধ্যায় হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

চিন্তাধারা সিরিজ

উপজাতীদের সাথে আচরণবিধি

২১

শাইখ খামিস আল-মারওয়ানী আদ-দাহমী রহিমাহুল্লাহ





AL HIKMAH MEDIA



Al-Malahem Media

চিন্তাধারা সিরিজ- ২১

উপজাতীদের সাথে আচরণবিধি

শাইখ খামিস আল-মারওয়ানী আদ-দাহমী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



কীভাবে উপজাতীদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করবো? কীভাবে আমরা উপজাতীদের সাথে আচরণ করবো বা কথা বলবো, এটির মানেই হল কীভাবে তাদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করবো- এর কাছাকাছি। উভয়টা একটা আরেকটার অন্তর্ভূক্ত। আমরা উপজাতীদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করবো আন্তরিক দাওয়াত ও উত্তম আদর্শের মাধ্যমে। তাদের নিকট বেশি কথা বলার চাইতে আমাদের নিজ চরিত্র এবং উত্তম আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে আদর্শবান হিসেবে পরিচিত হতে হবে। অর্থাৎ নিজের দিক থেকে উত্তম আদর্শ উপহার দিতে হবে। এটাই মানুষের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং বিশেষভাবে উপজাতীদের মাঝে গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারক হয়।

আমরা আরেকটি বিষয় বলতে পারি যে, কোন জিনিস উপজাতীদের মাঝে অধিক প্রভাব সৃষ্টি করবে.. সেটি হল মনোতুষ্ট করা এবং উপহার প্রদান। এটিই হল উপজাতীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নববী নীতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের শুরুতে মদিনার মুনাওওয়ারায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে এবং মদিনার আশপাশের এলাকাগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। কিছু উপজাতী ও কিছু সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য কিছু এলাকা জায়গীর হিসাবে দান করেছিলেন। মানে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা বরাদ্দ থাকত। বিভিন্ন বিজয় ও গনিমতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির ন্যায় দান করতেন যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের ভয় করে না।

বাস্তবিকভাবেই আমরা যখন মুকাল্লা লাভ করলাম, তখন কিছু ভাইয়ের বুঝ ছিল, ইলম ছিল, কিন্তু তারা উপজাতীদের সাথে যথার্থ আচরণ করতে পারতেন না। তারা কী বলতেন? আমাদের নিকট সকল মানুষ সমান। ঠিক আছে, কিন্তু এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতিকে ভুল ধরা হল। তিনি হুনাইনের যুদ্ধে এসে কিছু কিছু উপজাতীয় গ্রাম্য নেতাদেরকে দান করলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র দু'দিন গত হয়েছে। অমুককে একশো উটনী দান করলেন, আরেকজনকে একশো উটনী, আরেকজনকে একশো উটনী, অমুককে পঞ্চাশটি। পক্ষান্তরে সেই আনসারী লোকগুলোকে কিছুই দিলেন না যারা উম্মতকে আশ্রয় দান করলেন, সাহায্য করলেন এবং উম্মতকে তাদের মাথায় তুলে রাখতেন। তাদেরকে কিছুই দিলেন না।

কেন তিনি এই ক্ষেত্রে মানুষের সাথে সমান নীতি অবলম্বন করলেন না। এটি কি ভুল ছিল? যদিও আচরণবিধি বুঝার ক্ষেত্রে এটা ভুল। হ্যা, আমাদের নিকটও সব মানুষ সমান, কিন্তু মর্যাদার কথা চিন্তা করলে তা ভিন্ন। হতে পারে জামাতে আপনার সাথে একজন ভাই বুঝমান, নিয়মানুবর্তী এবং সুশৃঙ্খল, যিনি সাধারণ প্রাথমিক একজন ভাই থেকে ভিন্ন। একজন সাধারণ উপজাতীয় লোক থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ নিম্নস্তরের উপজাতী, যার মাঝে কিছুটা মূর্খতাও আছে (তার থেকেও)। এখানে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির আচরণবিধি ভিন্ন হবে এটি স্বাভাবিক। এভাবেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে আচরণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও তাদের যামানায় মানুষের সাথে এরূপ আচরণই করেছেন। এজন্য কী হয়েছে? একবার একজন ব্যক্তি তার (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে, তিনি বললেন: তাকে অনুমতি দাও। সে গোত্রের কত মন্দ সদস্য! কিন্তু সে যখন প্রবেশ করল, তখন তিনি খুবই হাসি-খুশি ছিলেন। এটাই আচরণ!

সেই ব্যক্তির ঘটনা দেখুন, যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে ভীষণ জোরে টান দিয়ে বললেন, "হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে আমাকে দান কর। তোমার নিজের সম্পদ বা তোমার বাবার সম্পদ থেকে নয়"।

সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাড়িয়ে ফেলল। অত:পর নবীজি তাকে দান করার পরই সে শান্ত হল। তারপর ওই লোকটি বলল: তিনি অনবরত আমাকে দিতেই থাকলেন। অবশেষে তিনিই আমার নিকট আমার জীবন, পরিবার ও সন্তান থেকে অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন। এটাই শিল্প। সুতরাং উপহার প্রদান মানুষের সাথে ও উপজাতীয়দের সাথে আচরণের শিল্পসমূহের মধ্যে এটি একটি অন্যতম শিল্প।

জনৈক এক ভাই আমাদের নিকট আসলেন যিনি ছিলেন খুব কঠোর। তিনি বিভিন্ন উপজাতীদের সাথে সহজ ও কোমল পন্থায় আচরণ করাটাকে যেন আকিদার ত্রুটি এবং দ্বীনদারির ত্রুটি হিসাবে দেখতেন। তিনি এটিকে দ্বীনের বিধি-বিধান মানার ক্ষেত্রে এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতির মধ্যে সমস্যা মনে করতেন। এটি একটি ভুল বিষয়। এটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।

অতএব মানুষের সাথে আচরণের নিয়ম হল, যখন আমার নিকট কোন ভাই এমন বিষয় নিয়ে আসে, যে ব্যাপারে আমার কড়া নির্দেশ ছিল, তখন এই ভাইয়ের সাথে এই ব্যাপারে আমি একই রকম আচরণ করবো। অর্থাৎ আমি জানি, তার শিক্ষা-দীক্ষা কেমন, তার মান্যতা কেমন, অর্থাৎ তার শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের পরিমাণ কেমন। কিন্তু আমার নিকট আরেক ভাই আসলে, তার সাথেও এমন করবো?

না! এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শোধরে দেওয়া, সঠিক করে দেওয়া যেতে পারে। অতএব ব্যাপারটি স্পষ্ট যে, উপজাতিরাও ঠিক এরকমই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে চুলের মত মাপকাঠি নির্ধারণ করা যাবে না। এটাই ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি। এটাই তার জীবনের দর্শন ছিল। এসকল উপজাতীদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি।

ভাই, আপনার মাঝে যে উপাদানগুলো আছে, তার থেকেও অনেক ধরণের সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপনি কীভাবে কোনো ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে ফেলার চেষ্টা করেন। সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমরা যখন এই হিসাবে মানুষ থেকে দূরে থাকি যে, আমরা মনে করি, আমরা তাদের থেকে অধিক পবিত্র আত্মার অধিকারী, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, প্রশস্ত মনের অধিকারী, বা তাদের থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী, তখন আমরা নিজেদের জন্য খুব বড় বা ভালো কাজ করলাম না। আমরা নিজেদের জন্য সবচেয়ে সহজ ও কম ব্যয়বহুল পথটিই গ্রহণ করলাম। প্রকৃত বড়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব হল আমরা এ সকল মানুষদের সাথে মিশবো উদারতার প্রাণে পরিতৃপ্ত হয়ে এবং তাদের দুর্বলতা, ত্রুটি ও ভুলগুলোর প্রতি দয়াশীল হয়ে। তাদেরকে পবিত্র করা ও সুসভ্য করার প্রকৃত ব্যকুলতা নিয়ে এবং যথাসম্ভব তাদেরকে আমাদের পর্যায়ে উন্নীত করার চেতনা নিয়ে”।

আপনি কোনো ব্যক্তির মানোন্নয়ন করতে চান, আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সহ্য করতে হবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন। এক্ষেত্রে উপজাতীদের বিষয়টি সামনে চলে আসে। মুকাল্লায় তারা আমাদের সামনে আসল। তাদের সাথে আচরণটি ছিল এক প্রকার শক্তির। অর্থাৎ ময়দানে বা জামাতে একজন ভাই আরেকজনের সাথে যে আচরণ করে, অর্থাৎ যে ভাই, নিয়মানুবর্তী, সুশৃঙ্খল, মুজাহিদ এবং আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েছেন, ঠিক তার মত। এটা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। মানুষের মাঝে

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। লোকগুলোকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ উপজাতীয়দের সম্মান না করে। আমি জানি না এটা সঠিক ছিল কিনা। ওই সময় এটা কারো কারো মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

আমি বলি, ভাইয়েরা, এই উম্মতের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের জন্য, বিশেষভাবে উপজাতীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের আচরণ প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় ঠিক হয়ে যাবে না। বরং ভাইদের সাথে উঠাবসা করে মানুষের আচরণ দেখে তারা ঠিক হবে। জীবন পাঠ করে ঠিক হবে। খুব ধীরগতির পাঠ। কয়েক মাস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠ করে ঠিক হবে। তিনি (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে চলাফেরা করেছেন। তিনি এমনকি কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিকের এবং মুসলিমদের সাথে চলাফেরা করেছেন। যারা বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন ধরণের ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সকলের সাথে চলেছেন। অত:পর আমাদের সামনে একটি আদর্শ প্রকাশ করে গেছেন, যার অনুসরণ করা আবশ্যক, এমনকি তা অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং এটিই আল্লাহর ইবাদত।

এখানে আরেকটা বিষয় আছে যেটা আমার মনে এসেছে তা হল কীভাবে আমরা উপজাতীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ভুলে যাই অথবা নিজেদেরকে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের প্রথম কাজ হবে এ সকল লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের সংশোধণের চেষ্টা করা। যখন প্রকৃত অর্থেই আমাদের মধ্যে চিন্তা থাকবে, অর্থাৎ সব বিষয় ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা; এমন হবে না যে, যেন আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে দুনিয়ার হীন কোন বস্তু প্রদান করা হয়েছে। না এটা হতে পারে না। সে তো মুসলিম। ছাড় দেওয়া এবং কোমলতা অবলম্বন করা শরয়ী ওয়াজিব, যতক্ষণ বিষয়টা আল্লাহর শরীয়তের বিরোধী না হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“তুমি হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে আহ্বান কর। আর তাদের সাথে সেই পন্থায় বিতর্ক কর, যা সর্বোত্তম।” (সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫)

এগুলো সহজ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যদি আজ এগুলো অবলম্বন করি, তাহলে কারো সাথে সংঘাত হবে না। হিকমাহ ও উত্তম উপদেশ এবং এমন পন্থায় বিতর্ক করা, যা সর্বোত্তম। এটার প্রতিই আল্লাহ আদেশ করেছেন। আপনারা হাদিসের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে, যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি প্রতিনিধি দল আসলো, কতগুলো অস্বাভাবিক দাবি জানালো। এমন জিনিস, যা কেউ কল্পনা করতে পারে না। তারা লাতের ব্যাপারে সংলাপ করেছে। যা আপনাকে দুই মাস বা তিন মাসের জন্য তাকে ছাড় দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন: তোমরা কালিমা মেনে নাও এবং বায়আত গ্রহণ কর। পরিশেষে আপনি এটা কিভবে গ্রহণ করবেন? কিন্তু দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলছেন, তিনি বলেন: তবে দ্বীন এটার অনুমোদন দেয় না। মুসলমানের মূল বিষয় তাওহিদের আকিদা। তখন তিনি বললেন, এটা (লাত মূর্তি) ধ্বংস করতেই হবে। তখন তারা কী বলল? তারা বলল, তাহলে আমাদেরকে এটা ধ্বংসের ইস্যুতে ক্ষমা করুন।

যদি আমাদের কেউ এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হত, তাহলে বলত: না, তোমরা অবশ্যই গিয়ে এটা ভেঙ্গে ফেলবে। যেন আমরা তাদের অন্তর থেকে জাহিলিয়াতের কুমন্ত্রণাগুলো বের করে ফেলতে পারি। তোমরা তা ভেঙ্গে ফেলবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তাদের হাতেই অথবা অন্যদের হাতে ভাঙ্গা হবে। আমরা তোমাদেরকে (এখন) ছাড় দিলাম। যাও হে অমুক, যাও হে তমুক।

প্রামাণ্য বিষয় হল, কে এসেছিল? ওয়ালিদ ইবনে শোবা, আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান গতকালই খন্দক যুদ্ধে মদিনা অবরোধকারী কাফের বাহিনীর লিডার ছিলেন। রাত-দিন হুবাল ও কুরাইশদের অন্যান্য মূর্তিগুলোর প্রহরা দিতেন। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে এবং এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই আবু সুফিয়ানই (রাঃ) লাত ধ্বংসকারী কোদাল বহন করেছেন। তার স্বর্ণগুলো জমা করেছেন। এই মানসিক পরিবর্তনটির প্রতি লক্ষ্য করুন, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্প্রদায়কে সেই মিথ্যা অবস্থা ও বাস্তবতা থেকে এই মহান অবস্থানে পরিবর্তন করেছেন। ফলে তারাই সেই মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে, যেগুলোর জন্য তারা নিজেদের আত্মা, নিজেদের সন্তানদের আত্মা এবং নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিত। আল্লাহ নবীজির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

এই প্রতিনিধি দলটির প্রতি লক্ষ্য করুন। আমরা এই কথার মধ্যেই উদাহরণটি দিয়েছি। কীভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরল ও বিস্ময়কর আবেদন ও পরিস্থিতিগুলোতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এইগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কীভাবে তাদের থেকে এটা গ্রহণ করে নিলেন। কীভাবে দলিলকে দলিল দ্বারা মোকাবেলা করে উভয় পক্ষ একমত হলেন এবং তার মাঝে ও তাদের মাঝে বায়আতনামা লিখলেন।

আমি বলি, হে ভাইয়েরা, এটাই হল মানুষের মানসিকতা। আজকেও ঠিক এই রকম মানসিকতা আছে। যাদের ওপর আল্লাহ রহম করেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবিরোধ ও সেই উপজাতীয় মানসিকতা থেকে যায়, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবোধ এবং আত্মসম্মান বিরাজমান। এটিই আরবদের আত্মসম্মান, বংশ গৌরব, আভিজাত্যের গৌরব। এরাই হল আরব যাদের মধ্যে তা এখনো বিরাজমান। কিন্তু দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কীভাবে ব্যবহার করলেন। কীভাবে তাদেরকে সংকীর্ণ আত্মচিন্তা ও গোত্রীয় চিন্তা থেকে এমনভাবে পরিবর্তন ঘটালেন যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে বৈশ্বিক তাগুত ও কুফরের মোকাবেলাকারী হয়ে গেলেন।

এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামও। আপনি যদি ইসলামী বিজয় ও সেনাবাহিনীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করেন, তাদের অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা প্রত্যেক গোত্রকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন। বনী তামিমকে তাদের অবস্থায়। অমুক গোত্রকে তাদের অবস্থায়। এরকমভাবে সেনাবাহিনী গঠিত হত এবং যুদ্ধ করত। কারণ হল, যেহেতু একটি গোত্র নিজ গোত্রীয় ভাইয়ের সাথে এবং গোত্রের সন্তানদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকে, তাই তারা পরস্পরে মিলে অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। ফলে তাদের দিক থেকে পরাজয় আসাকে তারা লজ্জার বিষয় মনে করে আত্মবিসর্জন দিয়ে যুদ্ধ করত। তারা যুদ্ধকে এভাবেই দেখতেন। আজ যদি আমরা এমন কথা বলি, তা হলে আমাদের কেউ কেউ এটাকে সাম্প্রদায়িকতা হিসাবে গণ্য করবেন। হ্যা, আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও শ্রেণীবিভেদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাহাবা ও সালাফগণ এই পন্থাটি ব্যবহার করেছেন। এভাবেই এই গোত্রগুলো তাওহীদের পাতাকা বহন করেছিল। আল্লাহ মহান নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

কতগুলো চাবি আছে। অর্থাৎ রহস্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চাবিগুলো নিয়ে কথা বলেছেন। মোটকথা, সর্বপ্রথম যে জিনিসটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, তা হল, হিকমাহ, উত্তম উপদেশ এবং এমন পন্থায় বিতর্ক, যা সর্বোত্তম। যখনই তার নিকট কোন গোত্রের ব্যাপারে সংবাদ আসত, অবাধ্যতার সংবাদ বা অন্য কোন সংবাদ, তিনি তাদের জন্য বাহিনী প্রেরণের পূর্বে প্রথমে তাদের জন্য দায়ী পাঠাতেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে সৈন্য পাঠাননি। বর্তমানে মাঝে মাঝে কিছু ভাই, সবচেয়ে সহজভাবে যে কথাটি বলে ফেলে, তা হল: তাদের উপর বিস্ফোরকের মাধ্যমে আঘাত হানুন, তাদেরকে বোমা মারুন। এক্ষেত্রে আমাদের মাঝে এক প্রকার বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আপনি কখনোই চাইবেন না যে, আপনার আন্তর্জাতিক জিহাদি কর্মসূচি, তথা আমেরিকান অহংকার ও দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং বিশ্ব কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদটি উপজাতীদের দিকে মোড় নিক। এখানে ঝগড়া, ওখানে বিতর্ক। এখানে অমুক নিহত হয়েছে, ওখানে তমুক নিহত হয়েছে। শুনেছেন, না শুনেননি। ইত্যাদি এগুলো নানাভাবে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলে।

এজন্যই আমাদেরকে উপজাতীদের সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের হিকমতের সাথে আচরণ করতে হবে। কারণ এমন লোক আছে, যারা ভাইদের সম্পর্কের মাঝে হাতুড়ি মারতে চায়। যেন ভাইয়েরা তাদের আসল টার্গেট থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। যেন আমরা প্রকৃত লক্ষ্য ভুলে যাই। ফলে আমরা উপজাতীদের সাথে বিরোধ নিয়েই বসে থাকি। আর প্রধান সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

এটা হল প্রথম বিষয়, হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া এবং সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করা।

দ্বিতীয় বিষয় হল সবর ও সহনশীলতা। আমাদের মাঝে ধৈর্যের মানসিকতা নেই। ভাই, যদি আপনার সাথে একটু বাঁধে অথবা আমাদের দলের সাথে বাঁধে, তখনও আমরা একে অপরকে সহ্য করি না। এটি ঠিক না ভাই। এর ফলে আমাদের মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি হিজরতের পূর্বে দাওয়াত দিতেন। নিজেকে আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলোর সামনে পেশ করতেন। কুরাইশরা তার সাথে কী করত? তার সাহাবাদের সাথে কী করেছিল? তিনি পথ অতিক্রম করার সময় দেখতেন, তার

সাহাবীগণকে নির্যাতন করা হচ্ছে, গ্রীষ্মের দিনে তাদের উপর ভারি পাথর রাখা হচ্ছে। তখন তিনি বলতেন: সবর করো হে ইয়াসির পরিবার। তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

আমরা মুজাহিদ, অথচ আমরা সবর করতে প্রস্তুত নই। যদি কোন এলাকায়, কোন ঘাটিতে বা কোন স্থানে আমাদের উপর হত্যা বা আঘাত আসে, তখন আমরা সবর করতে প্রস্তুত থাকি না। খুব দ্রুত আমাদের চেষ্টাগুলো কার্যকর করতে থাকি। এটা ভুল পন্থা। এটা রাসূলুল্লাহর মানহাজ নয়। তিনি সব বিষয়কে হিকমতের সাথে মোকাবেলা করতেন। সমস্যাটি নির্ণয় করতেন। সমস্যাটি বুঝতেন। তারপর সমস্যা অনুযায়ী জবাব দিতেন। যাতে এটা জামাতের উপর বহুগুণ সমস্যার কারণ না হয় এবং এর ফলে যাতে পুরো জামাত সমূলে ধ্বংস না হয়। আমাদেরকে এক এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছে আমাদেরই কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে। এগুলো বলা ঠিক নয়। কোথায় ধৈর্য, কোথায় সহনশীলতা! আমরা শাহাদাতের টার্গেট নিয়ে আছি। আমরা একটি মুসলিম সমাজের সাথে কারবার করছি। আল্লাহ নবীজির উপর রহমত বর্ষণ করুন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা শৈথিল্য বা তেলবাজি করবো। আমরা কতগুলো মুসলিম উপজাতীর সাথে কারবার করছি। কাফেরদের সাথে কারবার করছি না। আল্লাহ নবীজির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাই সবর করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহনশীলতা অবলম্বন করেছেন। তারা তার পথে কাঁটা বিছাতো, আবু জাহল ও আবু লাহাব তার মাথার উপর উটের নাড়িভুরি রাখত। তবুও তিনি গোত্রগুলোর নিকট নিজেকে পেশ করতেন। অপরদিকে আবু লাহাব তার পিছনে পিছনে গিয়ে বলত: তোমরা তাকে বিশ্বাস করো না। এই লোক মিথ্যাবাদী, এই লোক বিশ্বাসঘাতক। এভাবে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করত। এতদসত্ত্বেও তিনি সবর করেছেন এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা করেছেন।

আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন: উহুদের দিনের চেয়ে কোন কঠিন দিন কি আপনার উপর এসেছে? রাসূলুল্লাহ বললেন: “আমি তোমার সম্প্রদায় থেকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। সবচেয়ে কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলাম আকাবার দিন। আমি নিজেকে

ইবনে আব্দে ইয়ালিল ইবনে কুলালের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু আমি যা চেয়েছি সে তাতে সাড়া দেয়নি।" তখন নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। ঐ সময় বেলালের বগলের নিচে দাবিয়ে রাখা কিছু খাদ্য ছাড়া তাদের সাথে কোন খাদ্য ছিল না। দেখুন, আমাদের কেউ কেউ ধারণা করে, জামাত মানে সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন। না (এমনটা সঠিক নয়), আপনার কাছে আসবে আশ্রয়হীনতা, ক্ষুধা, পিপাসা। আশ্রয় দান করার মত কাউকে পাবেন না। তবু উম্মাহর বিরুদ্ধে এরকম কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, যা তাদের মধ্যকার নেককার, বদকার সকলকে আঘাত করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর করেছেন। তিনি আরো বলেন, অত:পর তারা নির্বোধদেরকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত। তারা তাকে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত করেছিল। এমনকি তার উভয় পা রক্তাক্ত করে ফেলা হয়েছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অত:পর আমি চিন্তিত-দু:খিত অবস্থায় চললাম। আমি কারনুস সায়ালিবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হুশ ফিরে পেলাম না। এটি দ্বিতীয় একটি অঞ্চল, যার নাম কারনুস সায়ালিব। এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন? কোন উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিলেন? দুনিয়ায়? না। বরং কীভাবে এই দাওয়াত পৌঁছে দিবেন সে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এ সময় তার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতা আসল। তিনি তার প্রসিদ্ধ দু'আটি করেছিলেন: "হে আল্লাহ আমি আমার শক্তির দুর্বলতা, উপায়হীনতা এবং মানুষের নিকট গুরুত্বহীনতার অভিযোগ করছি আপনার নিকট। আপনিই আমার রব এবং সকল দুর্বলের রব। আমাকে কাদের নিকট সোপর্দ করছেন। এমন দূরবর্তীদের নিকট, যারা আমাকে দেখে ভ্রুকুটি করে? নাকি এমন নিকটজনদের নিকট, যাদেরকে আমার উপর কর্তৃত্বশীল করেছেন। যদি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ না থাকে, তবে আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করি না। আপনার নিরাপত্তাই আমার জন্য সর্বাধিক বিস্তৃত নিরাপত্তা। আপনার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। আর আপনি ব্যতিত কোন উপায় বা শক্তি নেই"।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নিকট যদি কোনো বিষয় জটিল হয়ে যায়, তখন আমরা খুব কমই দু'আর আশ্রয় নেই এবং শক্তি ব্যবহারের দিকে ধাবিত হই - কীভাবে কোনো কিছুকে শক্তি দ্বারা সমাধান করা বা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। আল্লাহ নবীজির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন জিবরাঈল এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার সাথে পাহাড়ের ফেরেশতা আছে। আপনি যদি চান আমি তাদের উপর দুই পার্শ্বের পাহাড়দ্বয় চাপিয়ে দেই, তাহলে তাই করবো। আল্লাহ আপনাকে বলছেন: যদি আপনি চান, আমি তাদের উপর দুই পার্শ্বের পাহাড়দ্বয় চাপিয়ে দেই, তাহলে তাই করবো। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছিলেন? এই আত্মার একমাত্র চিন্তা ছিল এই দ্বীন, মানুষকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করানো। পক্ষান্তরে যদি আমাদের মধ্যে একজনের হাত বা পায়ে আঘাত করা হত, তাহলে কী হত। এখনো পর্যন্ত আমাদের কারো পায়েই তো আঘাত লাগেনি। উপজাতীরা তাদের ক্ষেত্রে এমন কিছুই করেনি। যদিও কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু হয়ত এতে আমাদেরই ভূমিকা ছিল, আমরা মানুষকে আমাদের স্বার্থে কিছু করার ব্যাপারে বিরক্ত করেছি। যদি আমাদের নিকট একজন ফেরেশতা এসে তাদেরকে ধ্বংস করার কথা বলত, তাহলে হয়ত তাদের একজনও বাকি থাকত না। ঠিক কি না?

এটা হল প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি আশা করি, আল্লাহ তাদেরই বংশধর থেকে এমন লোক বের করবেন, যারা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিবে এবং তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না।

যুগে যুগে দায়ী ও সংস্কারকদের চিন্তা-ভাবনা এমনই ছিল। আর তাদের সর্দার হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি বলেছেন: "আমি আশা করি, আল্লাহ তাদের বংশধর থেকে এমন লোক বের করবেন, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না"। কোন কোন বর্ণনায় আছে, "তাদের বংশধরদের বংশধর থেকে এমন লোক বের করবেন, যারা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিবে এবং তার সঙ্গে কোন কিছু শরিক করবে না"।

সুতরাং এখানে ব্যাপারটি হল এ সকল লোকদের (উপজাতি) দাওয়াত দিতে গিয়ে কষ্ট বরদাশত করা। কষ্ট বরদাশত করা, এই চেতনা আমাদের মাঝে থাকা আবশ্যক। হ্যা, কষ্ট বরদাশত করা। আল্লাহর পণ্য অনেক দামি। আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত। শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে

সবর নেই। মুসলমানদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সবর করতে হবে। এমনকি আমাদের কতিপয় ভাইয়ের ক্ষেত্রেও সবর করতে হবে। কারণ কত ভাই মাঝে মাঝে এমন সমস্যা নিয়ে আসেন, যা বাহির থেকে বুঝা মুশকিল। অতএব সবর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এটিই হল দাওয়াত। এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। সম্প্রদায়সমূহের লোকদের একে অপরকে সহ্য করা এবং একে অপরকে সাহায্য করা, এগুলোই হল তার আদর্শ। এটিই মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এবং উপজাতীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

উপজাতীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপায় ও পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করতে হবে। অনেকগুলো উপায় ও পদ্ধতি আমরা আপনাদের সামনে উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুজায়ী আল মুযানীকে মুযাইনা গোত্রের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তার নিকট আসতে বিলম্ব করলেন। মুযাইনা একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র। রাসূলুল্লাহর নিকট এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেহেতু এটা মদিনার নিকটবর্তী ছিল। তিনি বিলম্ব করলেন তার ডাকে সাড়া দিতে নয়, বরং তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন। কিন্তু তারা তাকে সাড়া দিচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসসানকে বললেন, খুযায়ীর প্রশংসামূলক আলোচনা কর, তবে তাদের নিন্দা করো না। ব্যাস, শুধুমাত্র তার মাঝে ও তাদের মাঝে যে ওয়াদা ছিল, সেটা উল্লেখ করলেন। তার প্রশংসামূলক আলোচনা করলেন, কিন্তু তাদের নিন্দা করলেন না। কবিতার পংক্তিগুলো খুযায়ীর নিকট আসল। কবিতার ৩ টি পংক্তি। তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের সামনে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: লোকটির কবি বিশেষভাবে তোমাদের কথা উল্লেখ করেছে। তারপর তিনি তাদের সামনে কবিতার চরণগুলো বললেন। ফলে মুযায়না গোত্রের চারশো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর নিকট আসে এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করে।

উপজাতীদেরকে দাওয়াত দিতে গেলে উপযুক্ত উপায় ও পন্থাগুলো ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটা বলি না যে, যেকোন মানুষই উপজাতীদেরকে বা কতক শ্রেণীর মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে। কারণ কিছু নির্দিষ্ট পন্থা আছে। এ সকল লোকদের অতীত কীর্তিগুলো প্রশংসার সাথে উল্লেখ করা। অর্থাৎ তাদের গৌরবের ইতিহাসগুলো। এটাও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের অংশ।

চতুর্থ বিষয় হল (এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ) আমার নিকট যে সমাধান আছে তা আমি দিচ্ছি এবং আপনাদের থেকেও আপনাদের সমাধান শুনতে চাই। কারণ আমরা প্রায় সকলেই একই সমুদ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা এখানেই বসবাস করি। আর তা হল ইয়ামানের উপজাতীদের সমুদ্র যেখানে শতকড়া ৮৫ পার্সেন্টই উপজাতী। এ কারণে আমরা এই সমুদ্রের সাথে জড়িত। তাই আমরা সকলের কাছ থেকেই শুনতে চাইবো।

পঞ্চম বিষয়, গোত্রের অপরাধীকে শাসন করেই ক্ষান্ত থাকা। একজন সদস্যের অপরাধকে পুরো গোত্রের উপর চাপিয়ে না দেওয়া। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ ভাইদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তারা আল-মালাহিমের ভিডিও চিত্রে এই কথাটি বলেছেন। তারা একথা প্রকাশে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি শুধু নিজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। প্রায় পুরো ভিডিওটিতেই এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যে, অমুক ব্যক্তি তার সম্ভ্রান্ত গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না। এটা উপজাতীদের অনেকের মনে লেগেছে। উপজাতীরা মেধাবী। তাদের মাঝে একটা জিনিস আছে, তার নাম হল মর্যাদা এবং তা রক্ষা করার চেতনা।

সাধারণত তারা একজন হত্যাকারী, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে থাকবে না। অর্থাৎ উপজাতীরা একজন বিশ্বাসঘাতক সাজাপ্রাপ্ত লোকের সঙ্গে থাকে না। সে যাদের সঙ্গে খায়, যাদের সঙ্গে পান করে, তাদেরকেই সঠিক পথ দেখাবে (অর্থাৎ শত্রুর সুবিধাজনক স্থানগুলো বলে দিবে টার্গেট করার জন্য), এটাই তো শোভনীয়। যতগুলো গোত্র থেকে গুপ্তচর এসেছিল, তাদের প্রায় কেউই এই গোষ্ঠীটির জন্য কিছু করেনি কেন? কারণ তারা বলল, সে তো বিশ্বাসঘাতক। সে তো গাদ্দার। মানুষের সাথে গাদ্দারি করেছে। তাদের সঙ্গে গিয়েছে, তাদের সাথে পানাহার করেছে আর পরিশেষে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আল্লাহর শপথ, এটাই বাস্তবতা। আমরা শুধুমাত্র অপরাধী ব্যক্তি থেকেই বদলা গ্রহণ করবো বা শুধু অপরাধীকেই ধরবো। এটাই নববী আচরণবিধি। পক্ষান্তরে ব্যাপকভাবে গোটা গোত্রের উপর চাপানো, এটা ভুল কাজ। এটা উপজাতীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের পরিপন্থী।

সাধারণকরণ না করার বিষয়টিও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। অনেক সময় এমন শব্দ বের হয়ে যায়- 'হে অমুক এলাকার অধিবাসীরা আপনারা', বা 'হে তমুক এলাকার

অধিবাসীরা আপনারা আসুন'। আমার দৃষ্টিতে এটা ভুল পদ্ধতি। এমনকি যা ঘটেছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে গুপ্তচরের পরিবারও তাদের নিকট সংবাদ নিয়ে কথা বলতে পারে। তাদের এই অধিকার আছে। তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্কে এটা জিজ্ঞেস করার অধিকার রাখে যে, সে কী করেছে। তাদের এই অধিকারও আছে যে, আমরা তাদের নিকট বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিবো এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলবো যে, অমুক লোক অমুক কাজ করেছে। বা তমুক লোক তমুক কাজ করেছে। বা এই লোক গোত্রের একটি গ্রুপকে হত্যা করেছে। আমরা যদি এসে উপজাতীদেরকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য ধরি, তাহলে এটা ভুল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর শপথ, যেদিন তুমি আমাকে তাকে হত্যা করতে আদেশ করেছ, সেদিন যদি আমি তাকে হত্যা করতাম, তাহলে অনেক নাক তার জন্য কেঁপে উঠত। কিন্তু আজ যদি তুমি তাদেরকেই (গোত্রকে) আদেশ কর তাকে (গোত্রের অপরাধী সদস্যকে) হত্যা করতে, তাহলে তারাই তাকে হত্যা করে ফেলবে।" ঠিক কি না। তাই আসুন, আমরা সকলে একে অপরের নিকট আসি।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা থাকবেই। গোত্রপ্রীতি থাকবেই। কিন্তু কীভাবে আমরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে পরিবর্তন করবো? এরকম চিন্তাভাবনা করা এবং ধাপে ধাপে কাজ করাই হল দাওয়াতের মৌলিক একটি নীতি। এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মূলনীতি। নবীজি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলছেন: "যদি তোমার সম্প্রদায় নতুন ইসলাম গ্রহণকারী না হত, তবে আমি বর্তমান কা'বাকে ভেঙ্গে ফেলে ইবরাহিমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতাম। কিন্তু মানুষ সবেমাত্র কুফর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই এটা তাদের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে"। একারণে তিনি এমন একটি বিষয় পরিত্যাগ করলেন, যা মুসলমানদের ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত এবং মুসলমানদের ভিত্তি যা বর্তমান কা'বাকে ভেঙ্গে তাকে ইবরাহিমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা দরকার ছিল। তবুও তিনি করেননি। কাদের প্রতি লক্ষ্য করে? এসকল লোকের প্রতি। এমনিভাবে এখানেও একই।

কিন্তু এ সকল লোকদেরকে নিরপেক্ষ করে গড়ে তোলার আদর্শ পন্থা কী, যাতে তারা বাতিলের সাথে না দাড়ায়? কোন আদর্শ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা আবশ্যক,

যাতে এই উপজাতীগুলো জামাতের বিরুদ্ধে তাদের কাজগুলোর পক্ষে না দাড়ায় এবং তাকে প্রশ্রয় না দেয় এবং তাকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার না করে। অনেক সময় আমাদের কিছু কিছু কর্মই আমাদের কথার পোষাকের ভূমিকা পালন করে। আমরাই মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত করি। এটা হয় ভুল উপস্থাপনা অবলম্বনের কারণে। আমরা এটা ধরেই নেই যে, তারা দাড়াবেই, তারা এক, তারা দাড়াবেই ব্যাস। কীভাবে দাড়াবে? কীভাবে দাড়াবে? তাদের গোত্রের এই অপরাধী সদস্যটির পূর্বে তারা কীভাবে আপনার পক্ষে আপনার সাথে দাড়িয়েছিল?

তারা ছিল সাম্প্রদায়িক। আমরা এখন আলোচনা করলাম যে, সাম্প্রদায়িকতা গোত্রীয় লোকদের মন-মানসিকতার একটি মৌলিক বিষয়। এটা সেই জাহিলি যামানা থেকে এখনো পর্যন্ত। সাম্প্রদায়িকতা তাদের একটি মৌলিক বিষয়। আপনি কখনো এটা ভাববেন না যে, কেউ গোত্রীয় লোক, কিন্তু সে সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা কীভাবে এই সাম্প্রদায়িকতাকে নিরপেক্ষ করবো এবং কীভাবে এটাকে ব্যবহার করার জন্য বা কমপক্ষে নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বোত্তম পন্থাটি অবলম্বন করতে পারি। আল্লাহ মহান রাসূলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আমি বলি, ভাই, গোত্রীয় সবাই তার গোত্রের অপরাধী লোকটির পক্ষে এমনভাবে থাকে না যে, তার হুকুম (পক্ষপাতি লোকটির) তার (অপরাধীর) হুকুমের মতই হয়ে যায়।

একবার জনৈক ভাই এসে বলল, অমুক গোত্র পুরোটা মুরতাদ। কেন? কি কারণে? তারা অমুকের পক্ষে দাড়িয়েছে। কীভাবে এটা মুরতাদ গোত্র? কোন ভিত্তিতে আপনি তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করলেন? কোন ভিত্তিতে আপনি তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিলেন? সে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের জন্য বিস্ফোরক পাঠাতে চায়। আরো কত কিছু! আল্লাহ মহান নবীর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আমি মনে করি, এ বিষয়গুলো শরীয়ত প্রণেতার দায়িত্বে। তবে আমাদের কাছে যেটা স্পষ্ট এবং আমাদেরকে যেটার উপর নির্ভর করা আবশ্যক, তা হল, এই রকম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণবিধি অনুসরণ করা এই ধরণের গোত্রসমূহের সাথে। 'আমি যদি এখন তাকে হত্যা করতাম, তাহলে তার জন্য অনেক নাক কেঁপে উঠত।' প্রথম যুগ.. যদি আমি তোমাদেরকে সেই

সময় আদেশ করতাম। যে সময় ওমর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন- আমাদের একটি গাড়ি বোমা আছে... হে আল্লাহর রাসূল আমাকে ছেড়ে দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, না। যেন অনেকদিন পর তাকে এটা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। যখন স্বয়ং সেই আনসারীই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার ছেলে বলছে, যদি আপনি কাউকে আদেশ করতে চান, তবে আমাকে আদেশ করুন আমার বাবাকে হত্যা করতে। এরপর তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন, আমি যদি সেই সময় তোমার কথা শুনতাম, তাহলে অনেক নাক কেঁপে উঠত। কিন্তু আজ যদি আমি তাদেরকেই আদেশ করি তাকে হত্যা করতে, তবে তারাই তাকে হত্যা করে ফেলবে। এটাই সূক্ষ্ম বুঝ। অন্যের সাথে আচরণের বুঝ। উপজাতীদের সাথে আচরণের বুঝ। সাম্প্রদায়িক ও গোড়া লোকদের সাথে আচরণের বুঝ। বিষয়টা এমনই। পক্ষান্তরে পরিস্কার করার রাজনীতি... তথা প্রত্যেকেই অমুক উপজাতীর সঙ্গে অবস্থান নিয়েছে, অমুক অপরাধীর সঙ্গে অবস্থান নিয়েছে... এটা ভুল। এটা অনেক বড় বড় সমস্যার কারণ হয়। যে সমস্যা আজও পর্যন্ত আমরা কিছু কিছু অঞ্চলে টেনে আনছি।

তাই আমি বলি, ভাইয়েরা, এটাই আচরণ শাস্ত্র, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আশপাশের সেই লোকেদের সঙ্গে অবলম্বন করেছেন, যাদের মাঝে তিনি বসবাস করতেন। আর সর্ববৃহৎ যে সমুদ্রটিতে তিনি বাস করতেন, তারা হল উপজাতী। সুতরাং শাস্তি বা শাসন শুধুমাত্র মন্দাচারির উপরই সীমাবদ্ধ রাখা।

এরকম কিছু অবস্থায় বিভিন্ন মন্দাচার হয়। যেমন জনৈক সরদার বললেন, তিনি তাদের অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। দু:খিত ভাইয়েরা, আল্লাহ তাদেরকে এই ক্ষেত্রে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিরাট পরিশ্রম হয়েছে। আমি আবইয়ান, মুকাল্লা ও আরো অনেক অঞ্চলের এমন ঘটনা ও কাহিনী জানি। কারা এগুলো করেছে এবং কাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এর অনেক বিরাট প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই অন্তরে এটা বদ্ধমূল করতে হবে যেখানে আমাদের সকল ভাইদের থাকতে হবে।

সুতরাং ভাইয়েরা, উপজাতীদের সাথে আচরণের পদ্ধতি হল একটি শাস্ত্র। যা হল সাধারণ মুসলমানদের সাথে আচরণের শাস্ত্রের মত। আমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করি, মানুষের জন্যও তা পছন্দ করি। এটা ঈমানের গভীর বিষয়।

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না করবে"। (মুসলিম)

যেহেতু তিনি মুসলিম ভাই, তাহলে কেন আপনি চাইবেন সে জাহান্নামে প্রবেশ করুক। তাকে আন্তরিক দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করুন। হয়ত আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিবেন। তারপর হয়ত এক মুহূর্তের মধ্যেই সে আপনার কাতারে চলে আসবে। এ হল আচরণবিধির ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি। কিছু ভাইয়েরা জানেন না যে তারা ধীরে ধীরে উপজাতীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে।

এটি হল একটি দায়িত্ব, একটি গুরু দায়িত্ব। আর তাই ভাইয়েরা, এমনকি অনেক সমর্থকরাও লেনদেন প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করতে পারেন। বিষয়টিকে যথাসম্ভব সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা করুন। এখানে রাগ বা একগুয়েমিভাব না দেখানোই ভালো। উপজাতীয় ধারণা অনুযায়ী এটি একটি ভুল বিষয়।

মুহাজির ভাইয়েরা সমর্থক ভাইদের সাথেই থাকে। এটাই স্বাভাবিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। তবে এখানে কি বিষয়টা এইজন্য আলাদা হয়ে যাবে কারণ সে আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে একজন ছিল?

না। উদাহরণস্বরূপ যদি সে বলে থাকে যে, আমার ভূমি অতিক্রম করবেন না, তবে আমরা থেমে গেলে তো কোন সমস্যা নেই। কোথায় সেই বিজ্ঞতা? সেখানে সে অবস্থায় থেমে যেয়ে পরবর্তীতে আমরা উপজাতি গোত্রের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করবো। (এটাই তো উত্তম!)

তো এই ঘটনার কারণ কী ছিল? আমাদের মধ্যে থেকে কেউ আপনাকে বিষয়টা নিয়ে চটিয়েছিল? আমাদের কাছে সমস্যা মনে হওয়ার আগেই কেউ কি বিষয়টা নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করেছিল? আসলে প্রকৃত কারণ কি?

এ সকল বিষয়গুলোকে যথাযথ পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আর যে ভাই গোত্রীয় বিষয়গুলোতে তানযীম ও ভাইদেরকে জড়ায়.. আমাদের কাছে এমন কিছু নমুনা আছে যে, কতদিন পূর্বে এ বিষয়টাকে এভাবে ঘুরানো হয়েছে। তারা বলেছে, অমুকের গোত্র এরা। আমরা অমুক গোত্রের নিরাপত্তাকর্মী। অমুক কোন গোত্রের তা জানি না। পরিশেষে কী হয়? বিষয়টি তার মাঝে ও তার গোত্রীয় সম্পর্কের মাঝে বা তার মাঝে ও তার গোত্রের মাঝে গোত্রীয় বিরোধ হয়। বা গোত্রীয় কোন সমস্যা হয়। তাহলে সে চাচ্ছে, তার ও এ সকল লোকের মধ্যকার হিসাবটি তানযীমের মাধ্যমে চুকাতে!

এটি হল আমানত ও দায়িত্ব, (নিজের স্বার্থে গোত্রীয় বিষয়গুলোতে তানযীম ও ভাইদেরকে জড়ানো) বরং মুজাহিদ জামাতের মধ্যে এটা একটা অপরাধ। যে ভাই এটা করেন, তিনি এমন ব্যক্তি, যার দ্বীনদারির ব্যাপারে আমি অভিযাগ করি। এই ব্যক্তির নিয়ত সঠিক মনে করি না আমি। সে এমন হিসাব-কিতাব চুকানোর জন্য মুজাহিদগণের রক্ত ব্যবহার করছে, যা আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নয়। এই ব্যক্তি, এমনকি চাই মুহাজির হোক, এমনকি গোত্রগুলোর সাথে হোক। জামাতের আদর্শের ক্ষেত্রে, জামাতের শাইখদের ক্ষেত্রে, তার মধ্যে সমস্যা বিরাজমান। এই ব্যাপারটি একটি উপায়ে সমাধান হবে। আমি মনে করি এই গোত্রীয় সমস্যাগুলো যা অনেক রক্তপাতের কারণ হয়। এক্ষেত্রে আমি উপদেশ দিব, প্রত্যেক ভাই-ই এক্ষেত্রে থেমে যাবেন। এক্ষেত্রে মারকায থেকে মীমাংসা আসা আবশ্যক। এখানে মীমাংসা হবে মারযাকের পক্ষ থেকে। স্থানীয় আমীরের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উপজাতীয়দের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দেওয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে ভাইদের নিকট উপরের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সংবাদ থাকলে ভিন্ন কথা। কেন?

কারণ কেউ কেউ আমাদেরকে উপজাতীদের সাথে যুদ্ধে টেনে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত এটা জায়েয নেই। আমরা আমাদের শক্তিগুলো ব্যবহার করবো, অথচ আমরা একমাত্র আমাদের দ্বীনের জন্যই বের হয়েছি। তারপর কেন আমরা এটাকে মন্দ ও বেঠিকভাবে ব্যবহার করবো। এটা আমানত। এটা দায়িত্ব। আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে। চাই গোত্রীয় ভাই হোক এবং যেকোন এলাকায় বাস করুক অথবা হিজরীতকারী ভাইয়েরা হোক। আমরা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেই। আমরা

একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেই। পরিশেষে আমাদের কতগুলো নীতি এবং আদর্শ আছে।

চিন্তাধারা সিরিজ

২২

জিহাদের কষ্ট

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২২

জিহাদের কষ্ট

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



আল্লাহর পথে জিহাদের বিষয়টির অর্থই হল উবুদিয়্যাত বা দাসত্ব। এটা অনেক বড় বিষয়। জিহাদ অন্যান্য ইবাদতসমূহের মধ্যে একটি ইবাদত। তবে এটার নাম হল 'জিহাদ', যার অর্থই হল পরিশ্রম বা কষ্ট। এর মধ্যে কষ্ট আছে। সুতরাং ভাইয়েরা আজ আমরা এমন একটি পথে আছি, যেখানে কষ্ট আছে। মহান মর্যাদাময় আল্লাহ বলেছেন:

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَ هُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ ۚ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট তা অপ্রিয়।" (সূরা বাকারা ২:২১৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাদেরকে সম্বোধন করেছেন? এর প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম। অতঃপর আমি, আপনি এবং খাইরুল কুরুনসহ পরবর্তীতে আগত সকলেই এর মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত (এর ব্যাপকতা) থেকে বুঝা যায়:

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَ هُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ ۚ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট তা অপ্রিয়।" (সূরা বাকারা ২:২১৬)

সাহাবাদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নিকট অপ্রিয়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আর আজ আমাদের সাথে কে আছে?

তাদের নিকট জিহাদ অপ্রিয় ও কষ্টসাধ্য বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে যেকোন পশ্চাদপসরণ তাদের নিকট খুবই নিন্দনীয় কাজ ছিল। আর আজ যে জিহাদে যায়, সে নিন্দিত।

তাদের নিকট অপ্রিয় ছিল অথচ কুরআন তাদের সামনে নাযিল হচ্ছে। ওহী তাদেরকে বলে দিচ্ছে জিহাদ কী এবং কীভাবে করা উচিত! আর আজ পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টো। তাহলে অপছন্দের বিষয়টা কেমন হবে? নফসের উপর এটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

মনের জন্য সবচেয়ে' কঠিন হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যুদ্ধ ছিল তরবারির বিপরীতে তরবারি। বর্শার বিপরীতে বর্শা। এভাবেই চলছিল। আজ এমনটা নয়। যুদ্ধ পদ্ধতি ভিন্ন। অস্ত্র ভিন্ন। দুনিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে এসে শত্রু আপনার উপর আক্রমণ করবে। আপনি তাকে ঠেকাতে পারবেন না, কিন্তু সে আপনাকে আক্রমণ করেই যাবে।

আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন, জিহাদ সাহাবায়ে কেরামের নিকট অপ্রিয় ছিল, তা সত্ত্বেও তারা জিহাদ করেছেন, তাহলে আজ আমাদের জন্য কেমন অপ্রিয় হতে পারে? যখন অস্ত্র সংগ্রহের মাঝেই ভিন্নতা?

তখন যুদ্ধ ছিল নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে। আপনি অমুক ভূখণ্ডে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। আর আজ পুরো পৃথিবী যুদ্ধের ময়দান। আপনি আপনার ঘরের ভেতরেও যুদ্ধের ময়দানে আছেন। মসজিদে বা আপনি কোন সফরে পথ চলছেন, তখনও যুদ্ধের মাঠে আছেন।

শত্রু আজ আপনাকে টার্গেট করছে যেকোন স্থানে। কিভাবে আমাদের অপছন্দনীয়তা সাহাবায়ে কেরামের অপছন্দনীয়তা থেকে কঠিন না হয়ে পারে? অথচ রাসূলের সাহাবাগণের মাঝে সেই বিশাল ঈমান ছিল, যার নাগালও আমরা পাবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الأَعْمَشِ

“আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।” (সহিহ বুখারী – ৩৬৭৩)

আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। এখন যদি জিহাদ তাদের নিকট অপ্রিয় হয়, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কী হতে পারে?!

জিহাদের ইবাদতটি পরিশ্রম ও কষ্টের দ্বারা হয়। মন এই কষ্টকে অপছন্দ করে।

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

“তোমরা কামনা করছিলে কাঁটাবিহীন দলটি তোমাদের ভাগে আসুক।” (সূরা আনফাল ৮:৭)

রাসূলের সাহাবীগণ বদর যুদ্ধে আশা করেছিলেন আবু সুফিয়ানসহ ব্যবসায়ী কাফেলাটিকে ধরবেন। তারা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের আশা করেননি।

যাইহোক, জিহাদের মধ্যে কষ্ট ও পরিশ্রম আছে। তা সত্ত্বেও এটা করতে হবে। আর এই কষ্ট ও পরিশ্রমসহ জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে সর্বাধিক পবিত্রাত্মাদের যুগে, যারা হলেন রাসূলের সাহাবা। এতসব কিছুর পরও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তা চালিয়ে গেছেন। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে (কষ্ট, পরিশ্রম ও অপছন্দের মাত্রা) কেমন হতে পারে?

এর মধ্যে কষ্ট আছে, তা সত্ত্বেও আমল করতে হবে। কেন আমরা কষ্টটার বিষয়ে আলোচনা করছি?

আল্লাহর শপথ! কোন মানুষ বলতে পারবে না যে, জিহাদ আরাম। বরং আরামকে হারামকারী। তবে হ্যাঁ, এটা এমন এক দরজা, যার মাধ্যমে আল্লাহ চিন্তা-পেরেশানি দূর করে দেন। আমরা আমাদের বাড়ি-ঘরে হাজারো চিন্তা-পেরেশানিতে থাকি। এমন চিন্তা, যার চূড়ান্ত সীমা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। প্রত্যেকটি জিনিসই আপনাকে চিন্তায় ব্যস্ত রাখে। কিন্তু জিহাদের মধ্যে আপনার চিন্তা একটাই - আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা। এটা এমন এক দরজা, যার মাধ্যমে আল্লাহ চিন্তা-পেরেশানি দূর করে দেন।

অন্যান্য চিন্তা-পেরেশানি থাকে। তবে জিহাদের মধ্যে আপনার মূল চিন্তা একটাই। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন ‘ইসলাম ও মুসলিমদের চিন্তা’কে আমাদের একমাত্র চিন্তা বানিয়ে দেন।

জিহাদের প্রকৃতি এমনই। এর মধ্যে কষ্ট আছে। আর যদি বিনিময়ের দিকে তাকান, তবে জিহাদ হল মহান। অর্থাৎ ফরজসমূহের পরে আর কোন ইবাদতকে জিহাদের সমকক্ষ করতে পারবেন না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "ঈমানের পর কোন ইবাদত জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে না"।

জিহাদের সমকক্ষ কিছু হতে পারে না। জিহাদ হল - আল্লাহর জন্য, এই দ্বীনের জন্য এবং দুর্বলকে সাহায্য করার জন্য সব কিছু বিসর্জন দেওয়া। সুতরাং পরিশেষে জিহাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - পরিশ্রম, কষ্ট ও ক্লান্তি।

আরেকটি বিষয় হল - এই কষ্টের দ্বারা মহান আল্লাহ আপনাকে সুদৃঢ় করবেন। কত বড় একটি বিষয়!! আর আল্লাহর প্রতি আমাদের সুধারণা হিসেবে আমরা ধারণা করি যে, তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার প্রিয়দের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, আমীন।

আজ এই পুরো পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে লেগেছে, এমনকি ভিতর থেকেও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। কুফফাররা সর্বশক্তি দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আপনার বিরুদ্ধে এমন নোংরা জিনিসসমূহ দিয়ে যুদ্ধ করছে, যার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহর শপথ! কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

এতকিছু সত্ত্বেও আল্লাহ আপনাকে সুদৃঢ় রেখেছেন। অর্থাৎ তার মহান সঙ্গ দান করেছেন। আল্লাহর শপথ, এটা ইহাই প্রমাণ করে যে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ খুব শীঘ্রই আমাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিবেন। তিনি আমাদেরকে হেফাজত করবেন এবং আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর তিনি তো আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট বি-ইযনিল্লাহ। আমরা কেন "আল্লাহর প্রতি আমাদের সুধারণা হিসাবে" এই কথাটা উল্লেখ করলাম? কারণ আল্লাহ বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ :قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم « : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَ أَنَا مَعَهُ

"আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি আমার প্রতি বান্দার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করি"।" (সহিহ হাদিসে কুদসি – ২৪)

আল্লাহর শপথ, আমরা আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করি। প্রতিটি বিষয়ে ভালোরই ধারণা করি।

তাই আল্লাহর অনুগ্রহে আজও আমরা কল্যাণের মাঝে আছি। এই বিশাল ঘটনাবলীর মধ্যে, আমাদের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গ থাকাটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাওফিক দান করেন এবং আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখেন। আমীন।

চিন্তাধারা সিরিজ

২৩

বিজয়ের মানদণ্ড

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২৩

বিজয়ের মানদণ্ড

শাইখ কাসিম আর রিমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



যুদ্ধে বেশি হত্যা করতে পারা – এটা বিজয়ের কোন লক্ষণ নয়। যখন আপনারা দেখবেন, একজন সর্বদা বেশি হত্যা করে, বুঝবেন সে বিজয়ী নয়।

যখন কেউ প্রবেশ করে উদ্ধার করে নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারে, তখন সে বিজয়ী। কিন্তু যখন সে বেশি হত্যা করে, তখন সে বিজয়ী নয়। আমরা দেখতে পাই শত্রু এখন হত্যা বেশি করছে, জমায়েতগুলোতে বেশি বেশি আক্রমণ করছে। এর অর্থ কী?

এর মানে হল - এখনো সে ভয়ের মাঝে আছে। (হামলা) যখনই তীব্র করে, তখন তার অর্থ হল আমরা সরে পড়েছি, তাই সে আক্রমণের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এটাই সাধারণ নীতি। বিজয়ীর অর্থ অধিক হত্যাকারী নয়।

যুদ্ধ অব্যাহত থাকা – এটাই বিপরীত পক্ষ বিজয়ী না হওয়ার দলিল। তাই যখন দেখবেন আপনি শত্রুর উপর আঘাত হানার পরই শত্রু আপনার উপর দ্বিতীয় আঘাত হানে, তখন ধরে নিন যে, আপনি বিজয়ী। ভাইয়েরা সবচেয়ে বড় যে ভুলটিতে পতিত হন সেটা হল - শত্রু দ্বিতীয় হামলার জন্য বাহিনী প্রেরণ করলেই ভাইরা বলে উঠেন, 'আর কতদিন?'

এই হামলা তো এ কারণেই এসেছে যে, আপনি প্রথম হামলায় বিজয়ী হয়েছেন। একারণেই দ্বিতীয় বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছে। এর অর্থ হল, আপনি প্রথম হামলায় বিজয়ী হয়েছেন। তাই যখন দেখবেন শত্রু দ্বিতীয় বাহিনী প্রেরণ করেছে, তখন তাকবীর দিন 'আল্লাহু আকবার'। আমরা প্রথম হামলায় বিজয়ী হয়েছি। দ্বিতীয় যুদ্ধ আরো সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

যাইহোক, আমরা যদি সংশ্লিষ্ট যুদ্ধের ভূমিগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব - অনেক মুজাহিদ নিহত হয়েছেন। অনেক নারী আহত ও নিহত হয়েছেন। অনেকের সম্মান লুণ্ঠিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকেই অনেক দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এটা দেখার পর আমাদের হৃদয় বেদনাক্রান্ত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে তাদের (শত্রুদের) মাঝে এর চেয়ে বড় বেদনা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি চলমান ঘটনাবলী দেখি, তাহলে আমরা মুসলমানদের উপর আরো বেশি আঘাত দেখতে পাবো। (শত্রুদের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি মুসলিমদের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে) তুলনা করার জন্য নয় বরং এটার তো তুলনাই হয় না।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আপনি তখনই বিজয় দেখতে পাবেন, যদি দিনশেষে আপনি দুই কল্যাণের যে কোন একটিতে থাকতে পারেন। এই ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি শত্রু যদি বাহ্যত যুদ্ধে বিজয়ীও হয়, আর আপনি এখনো কাজে ব্যস্ত - তবে আপনি দুই কল্যাণের যেকোন একটির উপর আছেন তবে – আপনি বিজয়ী আর আপনার শত্রু পরাজিত।

অনেক সময় শত্রু যখন কোন একটি এলাকা দখল করে থাকে, তখন প্রশ্ন আসতে থাকে যে, 'কখন শত্রু পরাজিত হবে'?

শত্রু তখনই পরাজিত হবে যখন আপনি বিজয়ী হবেন। এর থেকে দু'টি মাত্রা সামনে আসে- আপনি পরীক্ষাটিকে কিভাবে চিন্তা করেন। অর্থাৎ অনেক সময় এমন স্থানে মৃত্যু কাম্য হয় না, যেখানে মৃত্যু লেখা আছে।

এজন্য আপনি যখন যুদ্ধের দিকে তাকান, তখন আস্থাশীলের দৃষ্টিতে তাকান। আর শত্রু যখন যুদ্ধের দিকে তাকায়, তখন মিথ্যার দৃষ্টিতে তাকায়। আপনাকে বলবে: আমরা ৮০০ হত্যা করেছি। প্রকাশ্যে এমন বদলার কথা বলে, যা অন্তরে নেই। সেটাকে মিথ্যায় রূপান্তর করে। নিজ সাথীদেরকে ধোঁকা দেয়।

কিন্তু আমরা এমন নই। আমরা যুদ্ধের লোক। আমরা আয়াতের বর্ণনানুযায়ী এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আলোকে বিজয়ী। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন:

(قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) (التوبة : 52).

"বল, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের একটি ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছো..." (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫২)

চাই আমরা বিজয়ী হই বা নিহত হই – উভয় হিসেবেই আমরা বিজয়ী। আমরা যে যুদ্ধে জড়াই, তাতে এটাই যৌক্তিক যে, যুদ্ধ আমরা চালিয়ে গেলে বিজয় একদিন আসবেই।

সরকারী বাহিনী সর্বদা যুদ্ধকে চূড়ান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আপনি যুদ্ধকে চূড়ান্ত করতে চেষ্টা করেন না। কারণ আপনার আকার দুর্বল। আপনার আকার ছোট। যখন আপনার সঙ্গীগণ ২০০০ টি অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, তখন আপনার শত্রুরা চার লক্ষ অস্ত্র সংগ্রহ করেছে।

ইয়া আল্লাহ! অস্ত্র, সাঁজোয়া যান এবং বিমান দিয়ে সে সর্বদা যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করে। তার লক্ষ্য থাকে – যুদ্ধ শেষ করে দ্রুত বের হয়ে যাবে। যুদ্ধ চলমান থাকা তার স্বার্থ নয়। আপনাকে বলবে, এটা চালিয়ে যাওয়া (আপনার পক্ষে) সম্ভব নয়। কারণ যতদিন অব্যাহত থাকবে, ততদিন তার ক্ষয় হতেই থাকবে। এই প্রকৃত বিজয়ের জন্যই আপনি অপেক্ষা করছেন। আপনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

অর্থাৎ আপনি যুদ্ধ চূড়ান্ত করতে পারলে করে ফেলুন। কেউ আপনাকে বলবে না যে, 'আপনি যুদ্ধ চূড়ান্ত করবেন না'। কিন্তু পৃথিবীর নীতি অনুযায়ী বিশাল বড় ও শক্তিশালী এক বাহিনী কতগুলো বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং যুদ্ধ চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে। তাই আপনি যুদ্ধ করুন এবং সরে পড়ুন, যেভাবে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সরে পড়েছেন।

কৌশলগুলো সেভাবেই কাজে লাগান, যেভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজে লাগিয়েছেন।

প্রতিদিন একটি কাফেলাকে আঘাত করবেন। অর্থাৎ আপনার পরিমাণ অনুযায়ী তার মোকাবেলা করবেন। আমি চাচ্ছি চলমান থাকা, আর আপনি বলছেন: 'কতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করবো'?

আপনি আমাকে বলছেন, কখন আমরা বলবো – বিজয়। শত্রু তো এই কথার কারণেই পাগল। কিন্তু আপনি বের হয়েছেন। বিশ বছর মোকাবেলা করেছেন। এখন প্রশ্ন করছেন, 'কতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করবো?'

ইবাদত তো এমনই। আল্লাহর শপথ, যখন আপনি জিহাদকে এমন আমল হিসেবে দেখবেন, যা আমাদেরকে জীবন দান করেছে - তখন কিভাবে আমরা তা ছাড়তে পারি?

আমরা কতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করবো? কেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো অন্যদের মত নয় যে, আমরা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো? অর্থাৎ খুব দুর্বল রাষ্ট্র। তড়িৎ সৃষ্ট রাষ্ট্র। এমনটা আমাদের লক্ষ্য নয়। এরা বিশ বছর যাবত যুদ্ধে আছে। যুদ্ধ চলমান। কেউ কি নামাযের ইবাদত করে অস্থির হতে পারে?

একই কাহিনী জিহাদের ক্ষেত্রেও। দশদিন বিশ্রামে করবে, তারপর আবার ফিরে আসবে নতুন করে যুদ্ধ করতে। জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। এটা স্থায়ী ইবাদত। যতদিন রাত-দিন বাকি থাকবে, ততদিন জিহাদ চলমান থাকবে।

তাই আমাদের কেউ এসে যেন এই কথা না বলে যে, কখন আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবো? আমরা চূড়ান্তকরণ চাই না। আমরা চাই, জিহাদের সকল শর্ত ও আরকান সহ জিহাদ চালিয়ে যাবো।

খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, শত্রু কীভাবে যন্ত্রণা ভোগ করছে। আল্লাহর শপথ, তারা এক মানসিক অশান্তিতে জীবন যাপন করে। কিন্তু মুজাহিদগণ এ অবস্থায় জীবন যাপন করে না।

এখান থেকেই শক্তি আসে। খুব সামান্য একটি গ্রুপ, বিশাল বড় দলকে আটকে রাখছে। কখন? যখন তারা ধৈর্যের পোষাকে সজ্জিত হয়েছে। যখন প্রকাশ না হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করেছে। এ দু'টি গুণ কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বৈশিষ্ট্য- সবর ও আত্মগোপন।

****

চিন্তাধারা সিরিজ

বিপদ মোকাবেলা করা

২৪

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরী রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২৪

বিপদ মোকাবেলা করা

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে যে ঘটনাটি ঘটেছে –

তারা যখন আসলো, তখন তার জন্য আগুন প্রজ্বলিত করল এবং তাতে লাকড়ি ফেলল। এখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তিনি একটি মহা বাণী বলেছিলেন। সেটি হল -

حسبي الله ونعم الوكيل

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক।"

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে, তার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসলেন। বললেন, "হে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)! আমার কাছে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?"

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কার জন্য কাজ করেছেন?

আল্লাহর জন্য। তিনি মানুষ থেকে বা আল্লাহর সৃষ্টিজীব থেকে কোন কিছু চান না। জিবরাঈল আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ হতে একটি সৃষ্টি। তিনি জিবরাঈল থেকে কিছু চান না। তিনি বললেন: "না, আপনার থেকে নয়। আপনি সৃষ্টিজীব। আমার মতই একজন। সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি জানেন আমি কী চাই"।

এটাই সর্বদা একত্ববাদীদের প্রকৃতি। তারা যখন কোন বিপদে পড়েন - চাই যত বড় বিপদই হোক, তখন তার কাছে দু'টি বিষয় থাকে:

১.আল্লাহর প্রতি সুধারণা এবং

২. দু'আ।

বিপদে আপনার জন্য এ দু'টি ছাড়া আর কিছু নেই। যখন আপনার সকল বৈষয়িক উপকরণ শেষ হয়ে যায়, তখন এ দু'টি বিষয় ছাড়া আপনার কিছুই থাকে না। এ দু'টি জিনিসের মাধ্যমেই ইনশাআল্লাহ আপনার নিকট আল্লাহর অনুগ্রহ আসবে। আল্লাহর প্রতি সুধারণা এবং দু'আ।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জানতেন, তিনি কার জন্য আমল করছেন। মহা পবিত্র আল্লাহর জন্য। তাই তিনি বললেন: “আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক”।

তখনই এই একত্ববাদীর সম্মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আগুনকে সম্বোধন করা হয়। আল্লাহর একত্ববাদী বান্দা, যারা নিজ দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকেন – তাদের নিকট সাহায্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে।

আল্লাহ বান্দার সাথে কারবার করছেন। তাইতো আল্লাহর মহান আদেশ আসে সরাসরি আগুনের প্রতি:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

“আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।” (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জিবরাঈলকে বলেননি বা এভাবে বলেননি, ‘হে জিবরাঈল, আগুনকে বল’। তিনি এটা করেননি। আল্লাহর বন্ধুদেরকে রক্ষা করা আল্লাহর কাজ।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” (সূরা ইউনুস ১০:৬২)

হাদিস শরীফে এসেছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

“আবূ হুরাইরা (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব”।” (বুখারী)

লক্ষ্য করুন ভাই, যুদ্ধের ঘোষণা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে।

ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুন থেকে মুক্তি পেলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে মুক্ত করলেন।

চিন্তাধারা সিরিজ

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর হুকুম আরোপ করা

২৫

শায়খ খালিদ আল-বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২৫

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর হুকুম আরোপ করা

শায়খ খালিদ আল-বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



এখানে আরেকটি বিষয় আছে, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর হুকুম আরোপের সাথে সম্পর্কিত। যখন তাদের থেকে এমন কোন কথা বের হয়, যা দু'টি দিকের সম্ভাবনা রাখে, একটি ভালো দিক, অপরটি মন্দ দিক, তখন হুকুম হবে এই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থা অনুযায়ী। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ উম্মাহকে এর অনুসরণ করতেই উৎসাহিত করেছেন। যেমন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا

"তোমার মুসলিম ভাই থেকে কোন একটি কথা বের হলে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার ভালো প্রয়োগক্ষেত্র পাও, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মন্দ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে না"।

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাহুল্লাহ বলেন:

كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتيك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا

তিনি আমার কয়েকজন সাথীর নিকট পত্র প্রেরণ করলেন, যারা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী ছিলেন। পত্রে লিখলেন: "আপনার মুসলিম ভাইয়ের যেকোন বিষয়কে সর্বোত্তম অর্থে প্রয়োগ করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট এর চেয়ে শক্তিশালী কোন আলামত না আসে। কোন মুসলিমের মুখ থেকে বের হওয়া কথার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তার ভালো প্রয়োগক্ষেত্র পান"। - আল-ইসতিযকার লিইবনি আব্দিল বার- ৮/২৯১

সালাফগণ বিরোধীদের উপর হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে এ নীতির উপরই ছিলেন। যার ভালোগুলো তার মন্দগুলোর উপর বিজয়ী এবং তার অবস্থা অনুসন্ধান করে তার ব্যাপারে সততা, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার ইচ্ছাই জানা যায়, তার ব্যাপারে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহহ রহিমাহুল্লাহ একদল আশআরী তার্কিক ও বক্তাদের কথা আলোচনা করার পর সাংঘর্ষিকতা দূর করতে গিয়ে বলেন:

"অপরদিকে এ সকল লোকদের প্রত্যেকেরই ইসলামের মধ্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা এবং পুণ্যকর্ম আছে। অনেক নাস্তিক ও বিদআতিদের খণ্ডনে এবং আহলুস সুন্নাহকে

বিজয়ী করণে এমন অবদান আছে, যা এমন কারো নিকটই অস্পষ্ট নয়, যারা তাদের অবস্থা জানেন এবং তাদের ব্যাপারে ইলম, সততা, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কথা বলেন।

কিন্তু যখন সর্বপ্রথম মু'তাযিলাদের ব্যাপারে গৃহীত এই মূলনীতিটি তাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেল, অথচ তারা ছিলেন জ্ঞানী-গুণী, তখন তারা এটা (এই মূলনীতি) প্রত্যাখ্যান করার এবং তার অবশ্য ফলাফলগুলো মেনে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন। আর এর কারণে তারা এমন কথামালা বলতে বাধ্য হলেন, যা আহলে ইলমগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। একারণে মানুষের মধ্যে একদল তাদেরকে সম্মান করতে লাগল, যেহেতু তাদের অনেক গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আরেকদল তাদের নিন্দাবাদ করতে লাগল, যেহেতু তাদের কথাবার্তার মধ্যে অনেক বিদআত ও ভ্রান্ত বিষয়াবলী চলে এসেছে। বস্তুত সব বিষয়ে উত্তম হল মধ্যমপন্থা। এটা শুধু এদের (আশআরী) ক্ষেত্রেই নয় বরং একদল দ্বীনদার আহলে ইলমের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা তার সকল মুমিন বান্দাদের পূণ্যকর্মগুলোই গ্রহণ করুন এবং তাদের মন্দগুলো ক্ষমা করে দিন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং আমাদের সে সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি পরম মহানুভব ও দয়ালু।"

যারা এ ধরণের ভুলের মধ্যে পতিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের নীতিও পুণ্যবান পূর্বসূরিদের নীতির মতই। তারা সত্য জেনেছেন, তার সাথে লেগে থেকেছেন এবং তার উপর অটল থেকেছেন আর বিরোধীদের জবাব দিয়েছেন, তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং তাদের প্রতি দয়া ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহহ রহিমাহুল্লাহ আল-ফাতওয়ার মধ্যে বলেছেন:

"আহলুস সুন্নাহর অনুসারী ঈমানদার আলেমগণ সত্য জানেন, সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন এবং রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করেন। তারা বিদআত করেন না। যে ইজতিহাদ করে কোন ভুল করে ফেলে, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওযর গ্রহণ করেন। আর বিদআতীরা খারিজীদের মত, তারা বিদআত আবিষ্কার করে, তাদের বিরোধীদের তাকফীর করে এবং তাদের রক্ত হালাল করে

দেয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই অন্যদের বিদআতকে খন্ডন করে। অথচ সে নিজেও বিদআতিই। ফলে বিদআতের মাধ্যমে বিদআতকে এবং বাতিলের মাধ্যমে বাতিলকে খণ্ডন করা হয়"। (ফলে এরকম খণ্ডনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ হক্ব প্রকাশিত হয় না।)

চিন্তাধারা সিরিজ

সামরিক বিভাগের কাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হয়!

২৬

শাইখ কাসিম আর রীমী রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২৬

সামরিক বিভাগের কাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হয়!

শাইখ কাসিম আর রীমী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



সামরিক বিভাগের কাজ ধাপে ধাপে হবে এবং একটি ধাপ অপরটির সাথে পরিপূরক হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ধাপে ধাপে কাজ এর অর্থ কী?

অর্থাৎ কাজের একটি ধাপ অতিক্রম করে আরেক ধাপ শুরু করা। এরপর আরেক ধাপ। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিয়ে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাবো। আপনি প্রথম দিন থেকেই যদি শত্রুকে পরাজিত করতে চান, তবে তা পারবেন না। প্রথম দিন থেকেই যদি আপনি দৌঁড়াতে চেষ্টা করেন, তাহলে পড়ে যাবেন। সামনে এগোতে পারবেন না।

আপনার কাছে এক টুকরো লৌহখণ্ড আছে। আপনি তা ভাঙ্গতে চাচ্ছেন। প্রথমে ডানে-বামে, বামে-ডানে আঘাত করবেন। এরপর আগুনে উত্তপ্ত করবেন। এক পর্যায়ে সেটা ভেঙ্গে যাবে। এভাবে প্রতিটি কাজের ধারাবাহিক ধাপ আছে।

একজন লোক আসলো আর আপনি তাকে বললেন: আসুন কাজে যোগ দিন। আর আপনি আশা করলেন যে, সে প্রথম দিন থেকেই কাজের নিয়ন্ত্রণ নিবে এবং বলবে অমুকের ওই জাতীয় কাজ বাদ দিন অথবা রাখুন।

প্রথম দিন থেকে সে নিজেকে উক্ত কাজের জন্য ওয়াকফ করে দিবে - না, এটা অসম্ভব, সে কখনোই এত অল্প সময়ে একটি কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না।

আরেকটা উদাহরণ দেখুন, ছাদে কীভাবে উঠা হয়? আপনার সামনে সিঁড়ি আছে। অনেকগুলো সিঁড়ি। ছাদে উঠতে আপনি কোত্থেকে শুরু করবেন? উপরের সিঁড়ি থেকে না নীচ থেকে?

অবশ্যই নীচের সিঁড়ি থেকে। এভাবেই হয়। মানুষ ধাপে ধাপে শিখে। একটি শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। স্বাভাবিকের চেয়ে খাবারের লোকমা বড় হলে আপনি শ্বাসরুদ্ধ হবেন।

তাই কার্যক্রম পরিমিত হতে হবে। কার্যক্রম হবে ধীরে-সুস্থে, ধাপে ধাপে। অর্থাৎ প্রথমজন, এরপর দ্বিতীয়জন, এরপর তৃতীয়জন আরোহণ করবে। এভাবেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। এই মূলনীতিটা আমাদের মস্তিষ্কে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

আপনি কোন কাজের দায়িত্ব নিলেন। যুবক শ্রেণী পুরোটাই নির্দিষ্ট একটি কাজে জড়ো হলে, মাসের পর মাস বসে থাকবে। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। কোন

কাজও সম্পাদন করতে পারবে না। বস্তুত এটা প্রাকৃতিক নিয়মেরও বিপরীত। আশা করি আপনারা এটা ভালই বুঝতে পেরেছেন।

এজন্য বলি, কাজ হবে ধাপে ধাপে। এমনিভাবে সামরিক বিভাগের কাজও ধাপে ধাপে হবে। একটি অপরটির পূর্ণতা দানকারী। তাই, যে অস্ত্র ক্রয় করবে তার কর্তব্য হচ্ছে - প্রস্তুতি উপযোগী অস্ত্রই ক্রয় করা। এ স্তরে আমাদেরকে আমাদের কর্মযজ্ঞের উপযোগী প্রস্তুতিই নিতে হবে।

গোয়েন্দা ও মিডিয়া ব্যক্তি প্রস্তুত করতে হবে। এ অঙ্গনের উপযোগী কার্যক্রমকে তারা প্রচার প্রসার করবে। এটাই হচ্ছে পরিপূরকের ধারা। এভাবে সামরিক বিভাগের কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌঁছাবে এবং সেইসাথে অন্যান্য কর্মকাণ্ডও।

আমি একটি কাজ শুরু করলাম। হতে পারে আমার পর আপনি এটাতে পূর্ণতা দান করবেন। আমি চাইবো এই কাজের মাধ্যমে শত্রুকে তটস্থ করতে। হতে পারে আমি একটি দিক দেখবো। তাই বলে শত্রুকে তটস্থ করতে আমাকেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমি সেটা বলবো না। হতে পারে দ্বিতীয় কাজটির মাধ্যমেও শত্রুকে তটস্থ করা সম্ভব। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে পূর্ণতা দান করবে। কাজের ধারাবাহিকতাও হবে ধাপে ধাপে। আর এটাই পরিপূরক।

চিন্তাধারা সিরিজ

গুপ্তচর ও গুপ্তচরবৃত্তি

২৭

শাইখ সাঈদ আল শিহরি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ-২৭

গুপ্তচর ও গুপ্তচরবৃত্তি

শাইখ সাঈদ আল শিহরি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



আপনি প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন, তখন এক ভাই এসে বললো: একটু থামুন! এখন আমাদের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি বিভিন্ন গোত্রের সাথে মু'আমালা করবেন, শামে আসা যাওয়ার পথে এই কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং তা আমাদেরও করতে হবে।

যেমন, কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরে গেলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতি কার্যক্রমকে বন্ধ করার জন্য সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলো। এরপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে একটি বাহিনী শাম অভিমুখে রওয়ানা **হলো** এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে কিছু তথ্য পাওয়ার পর কিছু সাহাবীকে নিয়ে ঐ বাহিনীর উদ্দেশ্যে বের হলেন।

পর্যবেক্ষণকারী (গুপ্তচর) মদিনায় ফিরে আসলেন এবং মদিনায় কিছু তথ্য সংগ্রহকারী রেখে গেলেন। (বদর যুদ্ধের পর মুমিনগণ) যখন কুরাইশদের থেকে গনিমত লাভ করলেন, তখন আল্লাহর হুকুমে কুরাইশদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়লো।

ধরে নিন যে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। তখন করণীয় হবে প্রতিদিনই কিছু গুপ্তচর বের হবে এবং ফিরে আসবে। তারা ডানে-বামে বিচরণ করে দেখবে যে, শত্রুরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছেছে কিনা? এভাবে লাগাতার পর্যবেক্ষণ চলতে থাকবে। তবে পর্যবেক্ষকের জন্য জরুরী হলো, তিনি তথ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হবেন। কারণ, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে যিনি তথ্য পৌঁছান তিনি আমাকে যখন কোন তথ্য দেন তার মানে হলো; একশত ভাগ ঐ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই তথ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

তাই আবশ্যক হলো যে, তথ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ, কোন ভাই হয়তো একটি দলকে পর্যবেক্ষণ করে আপনাকে বলবে যে, এখানে ৫০০০ সৈন্য আছে। কিন্তু দেখা গেলো তাদের মধ্য হতে ৩০০ বা ৪০০ বা ৫০০ সৈন্য নিয়ে আপনার কাছে আসছে। তো এই ভাই সংখ্যা বলার ক্ষেত্রে গড়মিল করায় তার দেয়া অন্যান্য তথ্য যেমন, শত্রুদের শক্তি-সামর্থ্য, সম্পদ ও আরো

অন্যান্য বিষয়ে কিভাবে তার উপর ভরসা রাখা যাবে? কেননা তার তথ্য নির্ভুল নয়।

এক ভাই এসে আপনাকে বলবে যে, ডান দিকে চলো অথচ শত্রুবাহিনী বাম দিকে গিয়েছে!! তখন তার এই তথ্য আপনার জন্য কঠিন হয়ে গেল। বিশেষ করে ময়দানে নেতৃত্ব দেয় এমন ব্যক্তির কাছে যখন কোন তথ্য আসে তখন ঐ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তার কার্য সম্পাদন করতে হয়। যেমন, রাস্তা নিরাপদ নয়, সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়া ও কোন গুপ্তবাহিনীর হামলার শিকার হওয়া।

সুতরাং পর্যবেক্ষকের দেয়া তথ্যের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। আর খোলা মনের অধিকারী হতে হবে। পর্যবেক্ষক কয়েকদিন ধরে তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে, তারপর তা অন্যের কাছে পৌঁছাবে। কারণ, এটা বুঝা আবশ্যক যে, এই তথ্য ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত। তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মাসলাহাত রয়েছে।

মোটকথা, আপনার কাছে যে সকল তথ্য রয়েছে সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যখন কোন তথ্য অনুযায়ী কাজ করবেন - আপনার দীর্ঘ সময় সূর্যের নিচে গরমে থাকা, রাত্রে বা দিনের টনটনে ঠাণ্ডায় থাকা - আপনার এই ত্যাগ তখন শুধুমাত্র দ্বীনের জন্যই হবে।

আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি আপনার স্থানে অবিচল থাকবেন, স্থান ত্যাগ করবেন না। দিন-রাতের যে কোন সময়ে নির্দিষ্ট একটি গাড়ি আপনার পাশ দিয়ে হয়তো অতিক্রম করবে এবং ২৪ ঘণ্টার কোন সময় আপনি স্থান ত্যাগ করবেন না। এ সময় শয়তান আপনাকে ধোঁকা দিয়ে বলবে যে, এসো আমরা রাতের খাবার খাই অথবা দুপুরের খাবার খাই। আরে এই কাজ ছেড়ে দাও।

তখন আপনি তার প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ এটা আমীরের অবাধ্যতা। আর আমীরের কর্তব্য হলো, তিনি আপনার খাবার-দাবার সহ সর্বক্ষেত্রে আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

অর্থাৎ কার্য সম্পাদন করার জন্য উভয়ের মাঝে সংযোগ থাকবে। শুধু ভরসার উপর নির্ভর হয়ে নয়। বিষয়টি এরকম নয় যে, আমীর আপনাকে ছেড়ে দিবে বা আপনাকে কোন পথে নামিয়ে দিয়ে আমীর আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাবে আর

আপনি নিজের মত করে চলবেন। এ ধরণের বিষয় থেকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিৎ। কারণ, ইসলামী মূলনীতি একে সমর্থন করে না।

চিন্তাধারা সিরিজ

নিকটের শত্রু এবং দূরের শত্রু সংক্রান্ত মাসআলা

২৮

শাইখ কাসিম আর-রীমী রহিমাহুল্লাহ





AL HIKMAH MEDIA



চিন্তাধারা সিরিজ- ২৮

নিকটের শত্রু এবং দূরের শত্রু সংক্রান্ত মাসআলা

শাইখ কাসিম আর-রীমী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



AL HIKMAH MEDIA

بسم الله الرحمن الرحيم

পরিভাষায় শত্রু দু'প্রকার। অভ্যন্তরীণ শত্রু এবং বহিরাগত শত্রু। তো এই অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রু সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়েলের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিপাকে পড়তে হয়। ব্যাপারগুলো সমাধান করতে আমাদেরকে হিমশিম খেতে হয়। আমরা যদি অভ্যন্তরীণ শত্রু ও বহিরাগত শত্রুকে পরিভাষাগত দিক থেকে একই রকম মনে করি তখনই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে এই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। কিন্তু আমরা যদি নিকটস্থ শত্রু ও দূরবর্তী শত্রু প্রত্যেকের (পৃথক) পরিভাষা গ্রহণ করি, তখন মূল বিষয়ের চিত্র খুব সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে এবং এ সংক্রান্ত মাসয়ালা-মাসায়েল খুব সহজে আমাদের বুঝে আসে। তখন আমরা দেখতে পাই যে এ সংক্রান্ত মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলাদি ও শরীয়তের দলিলাদির মাঝে কোন সাংঘর্ষিকতা নেই।

যখন আপনি নিকটস্থ ও দূরবর্তী শত্রু (প্রত্যেকের আলাদা) পরিভাষা গ্রহণ করবেন, তখন সেটাই হবে আপনার জন্য সবচেয়ে সহজতর। আচ্ছা আমি যখন লড়াই করব তখন কার বিরুদ্ধে লড়াই করব? যে শত্রু আমার জন্য বড় হুমকি এবং যার ভয়াবহতা আমার জন্য অধিক তীব্র তার বিরুদ্ধে? নাকি যে শত্রুর ভয়াবহতা তুলনামূলক হালকা তার বিরুদ্ধে? যার পক্ষে আমার ক্ষতি করা বেশি সহজ তার বিরুদ্ধে? নাকি যে শত্রুর পক্ষে আমার ক্ষতি করা তুলনামূলক কঠিন তার বিরুদ্ধে?

আমরা নববী সিরাতের দিকে তাকালে এ কথার জবাব পেয়ে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যখন লড়াই করব, তখন তো আমি এমন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব যে আমার পথে বাঁধা হয়ে আছে এবং যার সাথে লড়াই করলে আমি উপকৃত হতে পারবো। যখনই আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো তখন তো আমি আমার কল্যাণের পথ বাঁধাহীন ও নির্বিঘ্ন করার জন্যই লড়াই করব। অর্থাৎ দেখা যাবে শত্রু আমার দাওয়াতের পথে বাঁধা হয়ে আছে। তখন আমি আমার দাওয়াতের পথ প্রশস্ত করার জন্য সে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমার এই লড়াই আমার দাওয়াতের জন্য কাজে আসবে।

(এখন প্রত্যেকে নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি)। কোনটি আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? নিশ্চয়ই আমাদের দাওয়াতের পথে বাঁধাদানকারীকে অপসারণ করাই গুরুত্বপূর্ণ। আমি শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চাই আর সে প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হয়ে আছে। তাহলে

কেন তাকে অপসারণ করা হবে না? সেই তো আমার শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

এখন আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার সম্মুখে আমার প্রধান প্রতিবন্ধক বহাল তবিয়তে থাকবে আর আমি তার শাখা-প্রশাখা অপসারণের পেছনে শ্রম ব্যয় করবো তা কি কখনো জায়েজ হতে পারে? কখনোই কি তা সুস্থ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত হতে পারে? কিছুতেই আমি এমন কাজ করতে পারিনা।

(এবার বাস্তব প্রেক্ষাপটে আসি)। বর্তমানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে সর্বপ্রধান বাঁধা হলো আমেরিকা। অন্যান্যগুলো প্রতিবন্ধক ঠিক আছে; তবে সেগুলো তূলনামূলক দুর্বল। তো এই প্রধান প্রতিবন্ধক অপসারণ করার ফায়দা হলো, এটা একবার অপসৃত হলে অন্যকিছু তার জায়গায় দাঁড়াতে পারবেনা। রোম ধ্বংস হয়ে গেলে আর কোনো রোম থাকবে না। এসব একবার ধ্বংস হয়ে গেলেই শেষ, আর কখনো মাথা তুলে দাড়াতে পারবেনা। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর হুকুমে সেটাই ঘটবে।

অর্থাৎ আমি বুঝাতে চাচ্ছি, আমার সামনে কুফরি শক্তির হর্তাকর্তারা রয়েছে, সেইসঙ্গে সাধারণ সেনাবাহিনীও রয়েছে। এখন আমরা কাদের বিরুদ্ধে প্রথমে লড়াই করব? কাদেরকে প্রথমে শেষ করব? নিশ্চয়ই হর্তাকর্তাদেরকে প্রথমে টার্গেট করতে হবে, চাই সে শত্রু আমার পাশেই থাকুক কিংবা দুনিয়ার শেষ মাথায় থাকুক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বহাল তবিয়তে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমার টার্গেটে থাকবে।

আমি সমকালীন বিশ্বের অবস্থানুযায়ী একথা বলছি যে, কুফরি শক্তির হর্তাকর্তাদের বেলায় নিকটস্থ হওয়া বা দূরবর্তী হওয়া শর্ত নয়। আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। আমাদের যুগেও তো কুফরি শক্তির হর্তাকর্তারা বর্তমান রয়েছে তাই না? তো এখন তারা কারা? আমরা জানি বর্তমান বিশ্বে কুফরি শক্তির হর্তাকর্তা ও মোড়ল হচ্ছে আমেরিকা। তো দেখা যাবে আঞ্চলিকভাবে কোন একজন সেনাপ্রধান কোন দেশে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আমেরিকার একটি অস্ত্র বা টুলস। এমনিভাবে কখনো হতে পারে কোন দল অথবা গোষ্ঠী আঞ্চলিকভাবে এক জায়গায় থাকবে কিন্তু তাদের পরিচালনার মূলে রয়েছে আমেরিকা। তো এখন এই কুফরি শক্তির হর্তাকর্তারা ভৌগোলিকভাবে কাছে থাকুক বা দূরে থাকুক, ধরা হবে

তারা আমাদের কাছেই রয়েছে। কারণ আমাদের ক্ষতি করার বহুবিধ সুযোগ তাদের হাতের মুঠোয়।

এখন প্রশ্ন হলো; কুফুরি বিশ্বের এসমস্ত হর্তাকর্তার উদ্দেশ্য কি? শরীয়তে তাদের হুকুম কি? কোন অর্থে তারা কুফুরি শক্তির হর্তাকর্তা? এরা তো এমন পর্যায়ের মুরতাদ যে তাদের কুফুরি অতি মারাত্মক ও তীব্র, তাদের কুফুরি একক নয় বরং বহুবিধ। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ আর অপতৎপরতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। তো এই অর্থে তারা অবশ্যই কুফুরি শক্তির হর্তাকর্তা। এখন চাই তারা আমাদের পাশেই থাকুক কিংবা দুনিয়ার শেষ মাথায় থাকুক। তারাই কুফরি শক্তির হর্তাকর্তা। এখানে বিষয়টা কোনো স্থান বা সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

আল্লাহর কসম! হতে পারে কুফুরি শক্তির এই হর্তাকর্তারা অভ্যন্তরীণ শত্রু আবার হতে পারে বাইরের শত্রু। এখানে ধর্তব্য হলো তার কর্মকাণ্ড। তাই কার্যতভাবে যেই শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াইরত তাদের বিবরণ যখন আমরা দিতে যাই, তখন আমরা এই কথা বলতে পারি না, আমরা কেবলই আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি। কার্যক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট তো শুধু আমেরিকা নয়, তাহলে আমরা কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি? হ্যাঁ আমরা আঞ্চলিক তাগুত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এখন কথা হচ্ছে এই তাগুত গোষ্ঠী কি কুফরি শক্তির হর্তাকর্তা কি-না? তারা আসলে কারা?

দেখা যাবে তারা কতক সেনাপ্রধান বা এমন কিছু। তো স্বাভাবিকভাবে কুফরি শক্তির হর্তাকর্তা হিসেবে তারা সকলেই বড় মাপের শত্রু। এখন যখন বিরাট শত্রু শ্রেণীকে টার্গেট বানাবার জন্য আপনি আলাদা আলাদা ভাবে দেখবেন, তখন সর্বপ্রথম কাকে আঘাত করবেন? আপনাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে অধিক অনিষ্টকর ও ভয়াবহ শত্রুকে টার্গেট করতে হবে। কুফুরি শক্তির হর্তাকর্তাদের বিবরণ যদি দিতে চাই তাহলে আরো বলতে হয় বিভিন্ন শান্তি পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা ও শান্তিরক্ষী বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তারাই হলো কুফরি শক্তির হর্তাকর্তা। এ কারণে তাদেরকে আমাদের টার্গেট বানাতে হবে যদিও তারা আমাদের আশপাশেই বসবাস করে। এর কারণ হলো আমাদের কাছাকাছি থেকে তারা আমাদের যতটা ক্ষতি করতে পারবে, তা আরও অনেক বড় বড় শত্রুদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই যে শত্রুর অবস্থান আমার জন্য হুমকি স্বরূপ

তাকে অবশ্যই আমি টার্গেট বানাব। এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে।

দর্শকদের জন্য আমি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করছি;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। **[**সুরা তাওবা - ৯:১২৩**]**

উক্ত আয়াতের নির্দেশ পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে তার নিকটবর্তী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং সে সময়ে দূরের অনেক শত্রুর ব্যাপারে তিনি ছাড় দিয়েছেন। এমনিভাবে আমরা আরো বুঝতে পারলাম, আয়াতে নিকটবর্তী শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের অর্থ এটা নয় যে, শুধুমাত্র ভৌগোলিকভাবে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়া, বরং এর সঙ্গে সময় ও কাল বিবেচনা করে এবং ক্ষতি করার সুযোগ প্রাপ্তি বিবেচনা করে যে শত্রু অধিক নিকটবর্তী, তাদের কথাও এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে।

ফুক্বাহায়ে কেরাম উক্ত আয়াত থেকে এমন অর্থই বুঝেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত আল উম্ম গ্রন্থে এ বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন "শত্রু শ্রেণীর অবস্থা যখন বিভিন্ন রকমের হয়, অর্থাৎ কতক শত্রু যখন অপর কিছু শত্রু অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক অনিষ্টকারী ও ভয়াবহ হয়, তখন ইমামুল মুসলিমিন সে শত্রুকে প্রথমে টার্গেট করবে যে তুলনামূলক অধিক অনিষ্টকারী।"

আজকে আই.এসের সদস্যরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এ কথা তো স্পষ্ট যে তারা সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করছে না তাই না? কিন্তু তারা কখনো একথা বলেনি, আমেরিকা আমাদের টার্গেট নয়; আমাদের টার্গেট তো হল আলে সৌদ রাজবংশ, আমাদের টার্গেট হলো শিয়া গোষ্ঠী, আর বাকিদের কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তা বললেই কি আর হয়ে যায়?!

আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি! আপনি তাদের জন্য যতই ছাড় দিন না কেন, তাদের জন্য যতকিছুই করেন না কেন, আপনি যদি একথাও বলেন যে, আমি বাস্তবেই জাতি রাষ্ট্রগুলোর সীমান্ত অস্বীকার করি, তবুও একথা ঠিক, সীমান্ত বাস্তবতা আপনাকে মেনে নিতেই হবে। আপনি তুরস্ক সৌদি কিংবা জর্ডানের এক বিঘত সীমান্তও লংঘন করতে পারবেন না। আপনি মানুন আর নাই মানুন সীমান্ত বাস্তবতা আপনাকে ছাড়বেনা। আর এই বাস্তবতার কারণে আপনি কখনই এক বিঘত সীমান্ত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পাড়ি দিতে পারবেন না। এখন যদি আপনি বিচ্ছিন্ন কাজকর্মে বাঁধা দেন, আমাকে যদি আপনি তাড়িয়ে বেড়ান, আমার বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমের কারণে যদি আপনি আমাকে পশ্চাদ্ধাবন করেন তাহলে এসবের ফায়দা কি হবে? এই সব কিছুর ফায়দা শত্রুরা ঘরে তুলে নেবে কিন্তু আপনি আপনার জায়গাতেই থাকবেন।

তাই এবার ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য খেয়াল করুন "যখন শত্রু শ্রেণীর বিভিন্ন রকমের হবে, কতক শত্রু অপর কতক শত্রু অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ ও অনিষ্ট সাধনকারী হবে, তখন ইমামুল মুসলিমিনের উচিত অধিক অনিষ্টকারী শত্রুকে আগে দমন করা। আর এর জন্য যদিও তুলনামূলক অধিক দূরবর্তী শত্রুকে প্রথমে টার্গেট করতে হয় তবুও কোন অসুবিধা নেই।

আর ইনশাআল্লাহ এক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হবেনা। কারণ হলো এ ক্ষেত্রে এমন শত্রুকে প্রথমে টার্গেট করা হয়েছে, তুলনামুলক যাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা অধিক, অবস্থান দূরে হওয়া সত্ত্বেও। আর তখন একাজ শরীয়তে বর্ণিত (জরুরীয়াতে দ্বীন তথা) আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আমরা জানি (জরুরীয়াতে দ্বীন তথা) আবশ্যকীয় অবস্থায় এমন অনেক কিছু জায়েজ হয়ে যায় যা সাধারণ অবস্থায় জায়েজ থাকেনা। আমরা জানি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হারিস ইবনে আবী যেরার এর ব্যাপারে অবহিত হলেন, যখন জানতে পারলেন এই লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে, তখন অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে টার্গেট করে বসলেন এবং তার ওপর হামলা চালালেন, অথচ সে সময়ে অপর কিছু শত্রু আরো অধিক নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু নিকটবর্তী সেই শত্রুদের তোয়াক্কা না করে নবীজি তুলনামূলক দূরবর্তী শত্রুকে টার্গেট করলেন বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে।

এমনিভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সংবাদ পেলেন খালিদ ইবনে আবি সুফিয়ান সৈন্যসমাবেশ করছেন, তখন তিনি উনাইস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু'কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। উনাইস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে হত্যা করলেন। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন তারচেয়ে নিকটের শত্রু নবীজির কাছে বিদ্যমান ছিল। এভাবেই আসলে শত্রুর অবস্থা বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। দেখা যাবে এক শত্রু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হয়ে আছে, আরেক শত্রু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে, এখন কি এই সময় রয়েছে যে তাকে নিকটস্থ শত্রু বা দূরবর্তী শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হবে? বরং তার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। এটাই শেষ কথা।

কিন্তু আরও কিছু বিষয় খুব ধীরে সুস্থে বুঝতে হবে। আজ তুমি মুসলমানদের রক্ত নিয়ে খেলা করছ। একজন মাত্র মানুষের জন্য তুমি কত জনের প্রাণ সম্পদের ক্ষতি সাধন করছ? একটি আঞ্চলে সাত হাজার মানুষের ক্ষতি ছোট বিষয় হতে পারে কি? এখন বলুন এটাই কি ইসলাম? এই সবকিছুর দায় তোমার উপর বর্তাবে। তুমি তোমার এই দায়িত্ব নিয়ে কোন তামাশা করতে পারো না। যুদ্ধ এবং যুদ্ধবিরতির মাসয়ালা কি তোমার জানা আছে? মনে রাখবে এগুলো সবই শরয়ী বিধি-বিধান। একারণে মানুষগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাদেরকে যথাসম্ভব ঝুঁকি থেকে বাঁচিয়ে রাখা তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ভাই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমার সর্বশেষ কথা এটাই যে, লোকগুলো তাদের ঘরে বসা ছিল। ব্যস এতোটুকুই তো। এখন আপনি তাদেরকে কোন ভুল সিদ্ধান্তের পেছনে পড়ে অসম কোন যুদ্ধে ঠেলে দিতে পারেন না। আপনার জন্য সেটা জায়েজ হবে না। একজন মানুষ নিজের ঘরে বসে আছে। একজন মানুষ নিরুপদ্রব নির্বিঘ্ন নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চেয়েছে। এমন একজন মুসলিমকে কেন অকারণে বিপদে ফেলতে হবে? এটা তো হতে পারে না। ব্যাপারটা বোঝা গেছে?

বর্তমান সময়ে মিডিয়া সন্ত্রাসের কারণে আমরা বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা নিজেরাও মিডিয়া সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছি এবং ভুলভাল তথ্য প্রচার করছি। আমরা যদি সঠিকভাবে তথ্য প্রচার করতাম এবং মিডিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারতাম কত ভালো হতো! এই তথ্য সন্ত্রাসের কারণে আল্লাহর কসম আমরা নিকটবর্তী শত্রু ও দূরবর্তী শত্রু চেনার ও বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার

হচ্ছি। এ কারণে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া আমাদের কর্তব্য। এই বিষয়টা সবার আগে গুরুত্বের সঙ্গে বোঝানো জরুরী।

একটি বিষয়: ধরুন আমি বললাম বহিরাগত শত্রু, ঠিক আছে? তাকে আমি কোনরূপ আঘাত করার কথা বললাম না। অপরদিকে আমি বললাম যে বহিরাগত শত্রু যার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত কিন্তু তথাপি আপনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন না। এখন বলুন এটা ঠিক নাকি ভুল? ইয়েমেনের কথাই ধরি। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সতর্ক করা হয়েছে এভাবে যে, বহিরাগত শত্রু, বহিরাগত শত্রু, বহিরাগত শত্রু.. কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়নি। শেষে কি হয়? বসে বসে প্রতিদিন বোমাবর্ষণ দেখতে হয় ঠিক কি-না? এটি একটি পয়েন্ট।

অপর একটি পয়েন্ট হল, এমন অভ্যন্তরীণ শত্রু যার বিরুদ্ধে আপতত লড়াই করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তথাপি আপনি তাকে ছাড় দিচ্ছেন না। আমরা অভ্যন্তরীণ শত্রু এই পরিভাষাটি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি, বরং আমরা যে পরিভাষা গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা হল নিকটবর্তী শত্রু ও দূরবর্তী শত্রু। কারণ এভাবে নিকটবর্তী শত্রু ও দূরবর্তী শত্রু পরিভাষা গ্রহণ করার দ্বারা এ সংক্রান্ত বিধিবিধান জানা ও বোঝাটা আমাদের জন্য সহজ হবে। ঠিক আছে কি-না? আচ্ছা। পূর্বের পরিভাষা দিয়েই বলি, বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে আবশ্যকীয়ভাবে আমাদের লড়াই করতে হবে। দেখা যাবে এক জায়গায় তার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত আরেক জায়গায় তার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত না। কিন্তু বাস্তবে আপনারা কি করলেন, যার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত তার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন না; আর যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত নয় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। ঠিক আছে কি না? ব্যাপারটা কি স্পষ্ট? আচ্ছা।

আমরাও বলছি বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। ঠিক আছে ভালো। তো ১১ ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাসহ অন্যান্য আরো বিভিন্ন ঘটনায় কৃতিত্ব এটুকুই যে, যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সঙ্গে এগুলোর মিল রয়েছে। এসমস্ত কার্যক্রমের সঙ্গে কিতালমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এই সামান্য সামঞ্জস্য দিয়ে তো আর পথ চলার পরিপূর্ণ নকশা দাগিয়ে নেয়া যায়না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোর সঙ্গে মিল দেখিয়ে সামান্য পান থেকে চুন খসলেই যদি আমরা বিভিন্ন ভবন ধসিয়ে দিই,

সামান্যতেই যদি আমরা তাদেরকে এরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে দিই, কোন জামাতের সঙ্গে সামান্য মতপার্থক্যের কারণে যদি আমরা তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হই, তবে আমরা জাতিকে নিয়ে কণ্টকাকীর্ণ এই পথ পাড়ি দেব কিভাবে?

কিন্তু আপনি যদি বাইরের শত্রুর দিকে আপনার তীর নিবন্ধ রাখেন তাহলে দেখুন তখন বিষয়টা কিরূপ হয়? আপনি কিছুতেই আপনার তীরের লক্ষ্যস্থল পরিবর্তন করে আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করতে পারেন না। আজ দাওলার সাথীদেরকে দেখুন তাদের কী অবস্থা? উচ্চ পর্যায়ের কেউই তাদের সঙ্গে থাকতে চাচ্ছে না। এর কারণ কি? কারণ অল্পতেই তারা মুসলিমদেরকে কাছের শত্রু বলতে আরম্ভ করেন। ঠিক আছে। তাহলে এখন সেই কাছের শত্রু কারা?

অভ্যন্তরীণ শত্রু ধারণাটি এখানেই আটকে আছে। যারাই তাদের জামাতের সঙ্গে যুক্ত হয়নি অথবা তাদেরকে বাইয়াত দেয়নি তারাই তাদের শত্রু। আমি উদাহরণ হিসেবে দাওলার সাথীদের কথা বললাম। কারণ তাদের সমস্যাটা এখন সামনে আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ও এটিই। এখন বিষয়টি স্পষ্ট হলো?

আচ্ছা এবার দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ে আসি সেটি হল শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখা। প্রিয় ভাইয়েরা আমরা জানি বর্তমান সময়ে শত্রু হচ্ছে আমেরিকা। তারা কত অর্থ খরচ করছে? আজ পর্যন্ত তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কত বিলিয়ন খরচ করেছে? আমরা জানি তারা অঢেল অর্থ খরচ করেছে। অনুসন্ধানী রিপোর্টগুলো থেকে জানা যায়, ২ বিলিয়নের অধিক অর্থ তারা খরচ করেছে। তারপরে তাদের যুদ্ধের সরঞ্জামাদির পেছনে ব্যয় হয়েছে ৪১ বিলিয়ন। যেকোনো অপারেশনে আনুষঙ্গিক আরো যেসব বিষয়াদি লাগে সমষ্টিগতভাবে সেসবের পেছনে ব্যয়িত তাদের অর্থের পরিমাণ ১২০ বিলিয়ন। আচ্ছা। এতো কিছুর পরও তারা ২৪ ঘন্টা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ভয়ের মাঝে তারা দিন কাটায়। আর এটাই ছিল শরীয়তের একটি মহৎ উদ্দেশ্য। কুরআনে কারীমে যে বর্ণিত হয়েছে:

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ

"যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর।"[সুরা আনফাল - ৮:৬০]

(অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রস্তুতির দ্বারা আল্লাহর শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখবে;) সমকালীন চিত্রে উক্ত আয়াতের বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছি। তার অর্থ আপনি সফলভাবেই শত্রুপক্ষকে উৎকণ্ঠার মাঝে ফেলে দিয়েছেন এবং তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পেরেছেন।

এই যে আমাদের মাথার উপর দিয়ে বিমান উড়ে যায় এগুলো কিসের ইঙ্গিত বহন করে? এগুলোর ইঙ্গিত হল, এ জায়গা নিয়ে তাদের আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে। এখন আপনার কাজ হল আমাদের আলোচ্য পয়েন্টটি খুব ভালোভাবে মাথায় রাখা। আমরা এ পয়েন্ট মাথায় রেখে আমাদের সকল তীর কুফুরি শক্তির হর্তাকর্তাদের দিকে নিবদ্ধ রাখবো। কারণ যদি আপনার আঘাতের সুযোগ থাকে কিন্তু আপনি আঘাত করলেন না, তবে আগামীকাল অবশ্যই অপরপক্ষ আঘাত করবে।

শেষে দেখা যাবে কেউ তো লড়াই করছে না। (আমরাই করছি) হ্যাঁ তারা লড়াই করছে ঠিক! কিন্তু এমন পদ্ধতিতে করেছে যাতে কোন সফলতা আসছে না।

তুমি যখন এ বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরবে, (তাদের জিহাদ দ্বারা উম্মাহের উপকৃত না হওয়ার বিষয়টি) তখন তারা বলবে; আমাদের একটি বড় সফলতা হচ্ছে; আমাদের আহবানে শুক্রদেশ থেকে হাজার হাজার মুজাহিদ এসেছে, যারা বর্তমানে তোমাদের অধিনে রয়েছে। আমরা তাদের বলবো; এসব মুজাহিদদের তোমাদের কাছে যেতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে; তোমাদের ভ্রান্ত আকিদার কারণেই তারা তোমাদের কাছে যাবে না। সুতরাং তোমাদের বুঝা উচিত তারা কেন আমাদের হয়ে লড়াই করছে?। কারণ; জিহাদ সংশ্লিষ্ট নীতিমালাগুলোর ক্ষেত্রে হকের দিকে প্রত্যাবর্তন, তাকে তোমাদের হয়ে লড়াইয়ের ময়দান থেকে অন্য ময়দানের দিকে নিয়ে এসছে।

কথা হচ্ছে; যতক্ষণ আল্লাহ তোমার বিজয়ধারা অব্যাহত রাখেন ততক্ষণ তুমি পশ্চিমের মানুষের মাঝে বিপ্লবিক মনোভাব তৈরীর চেষ্টা করতে থাক। চেষ্টা করতে থাক হে ভাই! সেখানকার অর্ধেক নয়, তিনভাগের একভাগ নয়, অথবা চারভাগের একভাগও নয় বরং শতকরা একজনের মাঝেও যদি তুমি বৈপ্লবিক মনোভাব তৈরী করতে পারো; তাহলেই তুমি সেখানে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারবে। এতে করে

আতঙ্ক সৃষ্টি করার দিক থেকে শত্রুর সাথে আমরা একটা তুলনামূলক অবস্থায় পৌছাতে পারবো।

কেউ কেউ বলে: দূরের শত্রুর সাথে লড়াই করাও তো জরুরী, অথচ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছো না। এটি সত্য কথা নয় যে, আমরা লড়াই করছি না, আমরা অবশ্যই লড়াই করছি। হ্যাঁ যদি কোথাও লড়াই থেকে বিরত থাকি তবে তা শরয়ী সিদ্ধান্তের আলোকেই।

যদিও কখন, কোথায়, কিভাবে লড়াই করতে হবে এই সংক্রান্ত শরয়ী মাসআলাগুলো ইজতিহাদ নির্ভর, তবু অমুক এই বলেছে তমুক ঐ বলেছে; এমন কথা বলে আমরা বিষয়টাকে গুরুত্বহীন মনে করতে পারিনা। এছাড়া রক্ত ঝরানো এবং কঠিন পরিস্থিতিগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীয়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশনার অনুসরণ করতে হবে।

আমরা দূরের শত্রুর বিষয়ে কথা বলছিলাম যে, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেই হলো প্রধান প্রতিবন্ধক। এজন্য আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াইকেই গুরুত্ব দেই। আমাদের কার্যনীতিতে এই বিষয়টাকেই গুরুত্ব দেয়া হবে। এভাবে শুত্রুদের মাঝে ক্রমান্বয়ে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আর এটিই হলো শরীয়তের মুল উদ্দেশ্য। আবার কাছের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধ করা হলেও, আমরা তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করবো। কেননা এরাই হলো আমাদের প্রথম শত্রু, যাদের সাহায্যে বহিরাগত শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো; কাছের বা দূরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মাসআ'লাটি এখানে হালাল হারামের মাসআ'লা নয়। উভয়ের সাথে লড়াই করাই বৈধ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো; তোমার কাছে যখন অনেকগুলো অপসন থাকে তখন তুমি কোন অপসন কাজে লাগাবে। আমাদের নির্দেশনা হচ্ছে তুমি সবগুলো অপসন বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপসনটাকে কাজে লাগাও। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ শত্রুর বিরুদ্ধ লড়াই কর। যদি তুমি আপাতত সফল না হও, অথবা দুশমন তোমাকে পরাজিতও করে, তথাপি তুমি এই মৌলিক নীতিমালার আলোকে লড়াই চালিয়ে যাবে। আশা করি আমি বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি।

এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি যে, তোমার মূল লড়াইটা হবে শত্রুর ভুখন্ডে গিয়ে শত্রুর স্বার্থে আঘাত করা। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি তুমি যদি আমেরিকাকে

আক্রমণ করতে চাও তবে তার ভুখন্ডে গিয়ে আঘাত করো। এটাই হবে প্রকৃত লড়াই। হ্যাঁ তবে চাইলে তাদেরকে আমাদের ভূখন্ডেও আঘাত করা সম্ভব। কেননা এখানে তাদের দূতাবাসসহ এমন অনেক প্রজেক্ট রয়েছে যেখানে আক্রমন করা যায়। এখানে স্থানীয় মুরতাদ সরকার রয়েছে, রয়েছে আমেরিকান দূতাবাস, ইত্যাদি..।

কিন্তু হামলার ক্ষেত্রে আমরা অন্যগুলোর উপর আমেরিকান দূতাবাসকে প্রাধান্য দিব। উদাহরণত তুমি এক ঢিলে দুটি পাখি আঘাত করতে পারো। অর্থাৎ আঘাতটা করতে হবে সামগ্রিকভাবে। এমন আঘাত, যাতে স্থানীয় মুরতাদসহ আমেরিকাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো; যেমনটি শইখ আবু ইয়াহইয়া ইয়েমানে আমাদের কার্যনীতি সম্পর্কে বলেছেন; সেখানে হুতিরা বলছে যে আমরা কাদের হয়ে লড়বো। আমেরিকার হয়ে না আলী আবদুল্লাহ (তখনকার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট) হয়ে। কিন্তু আমেরিকা তাদের বলছে; আমরা স্বতন্ত্র তোমরা স্বতন্ত্র। এখন আমরা হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি কারণ তারা তাদের শত্রুতার তীর আমাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা অবস্থায় শিয়া হুতি এবং আমেরিকা উভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবো। কিন্তু সামর্থ না থাকলে কাছের শত্রুকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং দূরবর্তী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবো। কেননা সে অবস্থানগত দূরে হলেও সামরিক ঘাটির কারণে সে এখন কাছের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সেই হলো আমেরিকা।

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.

চিন্তাধারা সিরিজ

২৯

দৃঢ়তা অবলম্বন ও হতাশা পরিহার

শাইখ ইবরাহীম আল বান্না হাফিযাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ২৯

দৃঢ়তা অবলম্বন ও হতাশা পরিহার

শাইখ ইবরাহীম আল বান্না হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সম্মানিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তার পরিবার-পরিজনের উপর এবং সাথীবর্গের উপর। আল্লাহ তায়ালা অনেক অনেক শান্তি বর্ষণ করুন তাদের সকলের উপর!

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَبَقُوٓا۟ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

অর্থ: "আর কাফেররা যেন এটা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না"। [সুরা আনফাল - ৮:৫৯]

প্রথমে এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজের শক্তিমত্তার কথা জানান দিচ্ছেন। তিনি ঘোষণা করছেন যে তিনি এতটাই শক্তিশালী যে আসমান-জমিনের কোন কিছুই সমকক্ষ হবার ক্ষেত্রে তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। আমি আলোচনার শুরুতেই এ আয়াতের মাধ্যমে ভূমিকা করেছি কারণ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আমাদের আস্থা যেন আরও অনেক বেড়ে যায়। আর আল্লাহর প্রতি আমাদের আস্থা বৃদ্ধি না করেই বা উপায় কী?!

বর্তমানে মুমিন ও মুজাহিদরা বাহ্যিক উপায়-উপকরণ, আধুনিক সরঞ্জাম, উন্নত টেকনোলজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হোক না কেন তারা কখনোই বস্তুগত বিচারে কাফেরদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। বিশেষত আধুনিক এই যুগে তো আরও না। আধুনিক প্রযুক্তিতে কাফেররা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে অক্ষম করতে পারেনি। তাইতো নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করছেন—

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة

অর্থ: "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে"। [সুরা আনফাল - ৮:৬০]

এ আয়াতে আমাদেরকে শুধুমাত্র নিজেদের সাধ্য অনুপাতে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তো উক্ত আয়াতে যে সামান্য প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে —

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

অর্থ: "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে"। [সুরা আনফাল - ৮:৬০]

অর্থাৎ, যথাসম্ভব শক্তি প্রস্তুত করা এবং ঘোড়া প্রতিপালন করা;

এটা আসলে কী কারণে বলা হয়েছে? সে কারণটি আয়াতের পরবর্তী অংশে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে আর তা হল—

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ

অর্থ: "(তোমরা শক্তি সঞ্চয় কর) যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন"। [সুরা আনফাল - ৮:৬০]

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সে প্রস্তুতির দ্বারা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করবে, এমনিভাবে আরও এমন শ্রেণীকে ভীতসন্ত্রস্ত করবে যারা এদের বাইরে; তোমরা তাদেরকে জানো না কিন্তু আল্লাহ ঠিকই তাদেরকে জানেন।

অপর শ্রেণীটি হলো মুনাফিকদের জামাত। কোন কোন তাফসীরগ্রন্থে এমনই এসেছে। যাইহোক, বলছিলাম আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের সাধ্যমত প্রস্তুতি

গ্রহণ করা। বাকিটা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব। তিনিই আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন।

আমার মাথায় আরও একটি চিন্তা এসেছে। তা হল - আমাদের শত্রুরা রাতদিন ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহকে পরাজিত করার জন্য তারা সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। তো একজন দ্বীনদার মুসলমান হিসেবে আমারও তো দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মানুষকে তাদের প্রকৃত প্রভুর দাসত্বে নিমগ্ন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে চেষ্টা করা। এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর উপর আমল করবো—

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ

অর্থ: তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা নিসা - ৪:১০৪]

শুধু কি তাই? এরপর ইরশাদ হচ্ছে—

وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ

অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর কাছে আশা করো যা তারা আশা করেনা”। [সুরা নিসা - ৪:১০৪]

আমাদের জন্য কত বড় অনুপ্রেরণা!! এখান থেকে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি আমাদেরকে সবকিছুর প্রথমে এই লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, যেভাবেই হোক আমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। আর এরই জন্য ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা যদি এই লক্ষ্য এভাবেই স্থির করতে পারি তবে কখনই ক্লান্তি ও অবসন্নতা আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা। আমরা কাফেরদের গৃহীত পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে যাব না। তারা তো একের পর এক চক্রান্ত করেই যাবে। মাসের পর মাস বছরের পর

বছর ব্যয় করে তারা সুদূর প্রসারী কত রকম পরিকল্পনা করবে! এতসব আয়োজনের আসল উদ্দেশ্য কী?

তারাও জানে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যতটা শক্তি ও সক্ষমতা প্রয়োজন ততটা তাদের হাসিল হয়নি। তাইতো তারা শক্তির সমতা তৈরির জন্য এত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর মহান গ্রন্থে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করো এবং লড়াইয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো"। [সুরা আল-ইমরান - ৩:২০০]

এখানে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে—**صبر ومصابرة ومرابطة**—অর্থাৎ ধৈর্যধারণ, লড়াইয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন এবং তাকওয়ার পথে লেগে থাকা। অতঃপর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—

وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ "এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো"। [সুরা আল-ইমরান - ৩:২০০]

তো আমরা এসব বলছি এজন্য, যাতে আমরা বিদ্যমান পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়ে না যাই। কখনোই যেন আমরা নিরাশ না হয়ে যাই। আল্লাহ মাফ করুন।

অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ওপর বোম্বিং হয়। বিমান হামলা করে আমাদের পাঁচজন, সাতজন ভাইকে শহীদ করে ফেলা হয়। একেকটি হামলায় আমাদের কত স্বজন শহীদ হয়ে যান। এসব দেখে কখনোই যেন কাফেরদের মোকাবেলায় আমরা নিরাশ না হয়ে যাই। আজ তারা শক্তির বড়াই দেখাচ্ছে। তাদের কাছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আর কী আছে? ড্রোন বিমান?

এসবের কথাতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে বলেই দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফেররা দেয়ালের পেছন থেকে এবং সুরক্ষিত মহলে অবস্থান করে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। দেখা যাবে সে সমুদ্র তীরে বসে আছে, কোন নৌযানে বসে আছে, অথবা স্থলে কোন কন্ট্রোল রুমে বসে আছে। এক কথায় সুরক্ষিত ঘাঁটিতে অবস্থান করছে। সেখানে বসে এ সমস্ত ড্রোন বিমান পাঠিয়ে রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে আমাদের উপর বোম্বিং করছে। কত নিরাপদ যুদ্ধ তাই না?

সুরক্ষিত স্থানে বসে তারা লক্ষ্যে আঘাত হানবে আর তাদের আঁচড়টুকুও লাগবেনা। আমরা যেখানেই যাই না কেন এভাবেই তাদের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছি এবং আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছি। তাই আমাদের বিশ্বাস এই হওয়া উচিত, কাফেররা যত শক্তি নিয়োগ করুক না কেন তারা কখনোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ব্যর্থ ও অক্ষম করতে পারবে না। আর আমাদের রব আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্তি প্রস্তুত করতে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তাওফিকে কাফেরদেরকে আমরা পরাজিত করতে পারব। কারণ আল্লাহ তায়ালা তো আমাদের মাওলা ও অভিভাবক, অথচ কাফেরদের কোন মাওলা নেই।

চিন্তাধারা সিরিজ

শত্রুর দুর্বল পয়েন্টসমূহ লক্ষণীয় বিষয়

৩০

শাইখ কাসিম আর রিমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩০

শত্রুর দুর্বল পয়েন্টসমূহ লক্ষণীয় বিষয়

শাইখ কাসিম আর রিমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



بسم الله الرحمن الرحيم

শত্রুর দুর্বল পয়েন্টসমূহ লক্ষণীয় বিষয়:

শত্রু পক্ষের শক্তির পয়েন্টগুলোর দিকে না তাকিয়ে আপনি তার দুর্বল পয়েন্টগুলোর দিকে নজর দিন। অর্থাৎ আমি যখন আমার শত্রুর সবদিক পর্যবেক্ষণ করব, যখন তার শক্তির পয়েন্ট ও দুর্বল পয়েন্টগুলো আমরা সামনে নিয়ে বসবো তখন আমাদের উচিত হবে - দুর্বল পয়েন্টগুলোকে ফোকাস করা।

আজ আমরা মার্কিনীদের বিরাট সৈন্য বহরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তাদের সৈন্য সক্ষমতা ৬০০ বিলিয়নের উপরে। গোটা বিশ্বে তাদের সৈন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আপনি তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলো দেখুন! তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র, টেকনোলজি ও গোয়েন্দা বিমান রয়েছে। এখন আপনি যদি তাদের এসব অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং সৈন্য সক্ষমতার দিকে তাকিয়ে তাকে বিচার করেন, তাহলে আপনার কিছুই করার সুযোগ থাকবে না।

তাদের এসব শক্তির পয়েন্ট দেখে আপনার নিজ জায়গায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। এজন্য আমাদেরকে শত্রুর দুর্বল পয়েন্টগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। দুর্বল পয়েন্ট বলতে আমি বুঝিয়েছি, তার অনুকূল ও প্রতিকূল অনেক পয়েন্টের মাঝে যেগুলো তার জন্য দুর্বল - সেই পয়েন্টগুলো।

তার প্রথম দুর্বল পয়েন্ট হল, সে বিশালদেহী আর আপনি সে তুলনায় ক্ষুদ্রদেহী। এটা আপনার জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এটা আপনার আমার জন্য আসলেই অনেক বড় নেয়ামত।

দ্বিতীয় বিষয় হল, আপনার শত্রু যেহেতু বিশালদেহী তাই সবকিছুতেই তার খরচ অনেক বেশি। সেই তুলনায় ছোট হিসেবে আমাদের খরচ অনেক কম। এটা আমাদের জন্য একটি শক্তির পয়েন্ট আর শত্রুর জন্য একটা দুর্বল পয়েন্ট। আমাদের পক্ষে পয়েন্টটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই যে শত্রুপক্ষ আজ দাবি করছে এবং হম্বিতম্বি দেখাচ্ছে যে - সারা বিশ্বের ওপর তাদের কর্তৃত্ব ও খবরদারি চলছে, এ অবস্থায় ছোট হয়ে তাকে আঘাত করা তার জন্য কতটা লাঞ্ছনার তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এ কারণে এটি আমাদের জন্য শক্তির পয়েন্ট।

আরেকটি পয়েন্ট হচ্ছে- শত্রু তার বিশাল দেহ নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আর আপনিও ভিন্ন আঙ্গিকে সব দিকে ছড়িয়ে আছেন। শত্রু আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না অথচ আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন।

এখানে আপনারাই বলুন - আমরা আমাদের এই শক্তির পয়েন্ট কীভাবে ব্যবহার করবো? এর একটা সুরত এমন যে, সারা বিশ্বে যত জায়গায় এই দানবের সৈন্য-ঘাঁটি ও সামরিক কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলোর যেকোনোটাকে আমি নিজের মতো বেছে নিয়ে আচমকা হামলা করে বসবো। আমি-আপনি হলাম ক্ষীণকায় আর আমাদের শত্রু হল বিশালদেহী স্থূলকায়। তো আমার উদ্দেশ্য হল, এভাবেই সর্বদা শত্রুর শক্তির পয়েন্টগুলোর দিকে না তাকিয়ে আমাদের তাকাতে হবে তার দুর্বল পয়েন্টের দিকে।

আচ্ছা এবার আসি শত্রুর শক্তিশালী পয়েন্টগুলো আমরা কিভাবে মোকাবেলা করবো? এর সমাধান হল- আমরা সেগুলো এড়িয়ে চলব। শত্রুর গোয়েন্দা বিমানগুলো আমরা এড়িয়ে চলব। আমি যদি সেগুলো এড়িয়ে চলি, তাহলেই শত্রুর শক্তিশালী পয়েন্টগুলো আমি সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারব।

টেলিফোন এবং গাড়ি ব্যাবহারের বিষয়টা নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিকভাবে দুটো বিষয়ে যদি আমরা উসুল মেনে চলতে পারি তাহলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর কোন চিন্তা নেই ইনশাআল্লাহ! আমরা যখন আমাদের চলাফেরা, যাতায়াত এবং যোগাযোগ উসুল অনুসারে পরিচালনা করব, তখনই আল্লাহর রহমতে শত্রুর সকল প্রযুক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তখন আল্লাহর রহমতে এরকম নিয়ম রক্ষা করে আপনি যেকোনো জায়গায় যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতির কারণে আমাদের ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতে হয়। আবার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারটিও স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজনীয় বিষয়। আর এ দুটি বিষয় সর্বদাই বাহ্যিকভাবে পরস্পরবিরোধী।

তাই দুটি বিষয় ক্ষেত্রবিশেষ সমন্বয় করে চলার চেষ্টা করা, কিভাবে সমন্বয় করবে? অর্থাৎ মানুষের মাঝে প্রকাশ্যে বিচরণের সময় কি করবে? সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঠিক রেখে স্থান পরিবর্তন করবে। আপনি নিরাপত্তা ঠিক রেখেছেন এবং স্থানও পরিবর্তন করেছেন, এখানে দুটি বিষয়ের সমন্বয় হয়েছে। আপনি স্থান পরিবর্তন

করেছেন, আপনার শত্রুও স্থান পরিবর্তন করেছে, এক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঠিক থাকলে কেউ কারে মুখোমুখি হবে না। সুতরাং তার নিকট যে অস্ত্র আছে আপনার নিকট তা নেই।

ফলে সে (শত্রু) আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারে কিন্তু আপনি তার কাছে পৌঁছাতে পারেন না। এ কারণেই যদি আপনি (নিরাপত্তার বিষয়টি খেয়াল না করে) নড়াচড়া করেন, তবেই সে শিকার করে ফেলবে। আর যদি আপনি কোনও কাজ নিয়ে বসে থাকেন যে, তা ঠিক আছে কি-না? তখন হয়তো কোন বিষয় সামনে আসে?

এমন পরিস্থিতিতে নবীজি ﷺ কি করেছেন এবং কিরূপ নির্দেশনা আমাদের জন্য রেখে গেছেন? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন যে, তিনি নড়াচড়া করলে শত্রুরা তাকে ধরে ফেলবে, তখন তিনি আত্মগোপন করেছেন এবং মুক্তির পথ অবলম্বন করেছেন। কি ছিল সেই মুক্তির উপায়?

লক্ষ্য করুন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন ভিন্ন স্থানের দিকে ইংগিত করতেন। কৌশল হিসেবে তখন ভিন্ন কোন স্থানের নাম নিতেন। অর্থাৎ আপনাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বসে না থেকে সেই নিরাপত্তা বলয়ে থেকে আপনাকে পথ চলতে হবে। এটা কি উচিত যে আমরা ঝুঁকির ভয়ে সব কিছু ফেলে কোন একটা কিছু নিয়েই বসে থাকবো?

না কখনোই নয়। কেউ সে কথা বলছেও না। বরং আমাদেরকে কাজ করতে হবে কিন্তু সেটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

হে ভাই লক্ষ্য করুন,

আপনার কাজের জন্য আপনাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। কেউই আপনার স্থান পরিবর্তনের কথা জানার কথা নয়। আপনি টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন না। আপনি হয়তো পরিচ্ছন্ন সুন্দর গাড়িতে করে যাতায়াত করেন। সে ক্ষেত্রে আপনার পার্সোনাল যে গাড়ি দিয়ে আপনি যাতায়াত করেন সেটিরও রূপ পাল্টে ফেলুন। অতঃপর যাতায়াত করুন।

এমনভাবে আপনি নিজ অবস্থানস্থল থেকে যাতায়াত আরম্ভ করবেন না। এতে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রু আপনাকে এবং আপনার অবস্থানস্থল চিনে ফেলবে। তাই

আপনি প্রথমে অন্য কোথাও সপ্তাহখানেক সময় অবস্থান করুন। অতঃপর আপনি আপনার দীর্ঘ-যাত্রা আরম্ভ করুন। স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার যাত্রা যেরূপ হয় তা থেকে আলাদা করে আপনি আপনার যাত্রা করুন।

এ বিষয়গুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব এগুলো অবশ্যই আমাদের সকলেরই সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে এবং এগুলো আসলেই কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

চিন্তাধারা সিরিজ

৩১

জামাআতের দুটি স্তম্ভ

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩১

জামাআতের দুটি স্তম্ভ

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



بسم الله الرحمن الرحيم

শুরু করছি আল্লাহ তায়ালার নামে যিনি পরম করুণাময় এবং অতি দয়ালু।

শাইখ সাঈদ আশ-শাহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন: (জামাআতের দু'টি স্তম্ভ) যেমনটা আমরা পূর্বেই বলেছিলাম, আমাদের বাস্তব অস্তিত্বই হল সংগঠনগুলোর একটি বাস্তব অস্তিত্ব। এই সংগঠনগুলো শরিয়ত ও সুদৃঢ় মজবুত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ইসলামি দলগুলোর মধ্যে অবশ্যই দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে।

প্রথমটি হল: তাদের চলা-ফেরা, উঠা-বসা যেই নীতি ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল, কুরআন এবং সুন্নাহ। উম্মাহর সালাফগণ এগুলো নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যাতে এই দলগুলো শরয়ীভাবে স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল: সম্পর্ক স্থাপন ও বর্জন করা (তথা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা)। এই বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, অন্য কোন দল বা সংগঠনের জন্য নয়। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর আনুগত্য করে তাদেরকে সমর্থন করা এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, আর যারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা। হোক সেটা কোন সংগঠন, দল বা অন্য কিছু।

সাধারণত, মুসলিমরা হল ভাই ভাই। মুমিনরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত যতক্ষণ না তাদের মধ্যে এমন কিছুর উদ্ভব ঘটে যা তাওহীদের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা এই মুসলমানদেরকে ভালবাসি এবং তারা কতটা দ্বীনদার ও নিষ্ঠাবান সে অনুপাতে তাদের সাথে আচরণ করি।

হে প্রিয় ভাই!

এগুলোই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয়। যা আমাদের মাঝে বাস্তবায়ন করা দরকার। এখন আমরা বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করবো। আমাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন এবং সুন্নাহ হতে হবে আমাদের মূল ভিত্তি। আমি বলতে চাচ্ছি - আমাদের অবশ্যই একটি দৃঢ় ভিত্তি থাকতে হবে যেটি থেকে আমরা সাহায্য খুঁজে পাব। যাতে করে জিহাদ কোনো ইজতেহাদী (আইনশাস্ত্রীয়) ভুল বহন না করে, বিশেষভাবে রক্ত এবং সম্মানের ক্ষেত্রে। কারণ এ দু'টি বিষয়ের বিবরণ কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে বর্ণিত রয়েছে।

কখন রক্ত ঝরানো এবং সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ হতে পারে - এই দুটি বিষয় আল্লাহর কিতাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং স্পষ্ট। সুতরাং কেউ যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই' - তবে সে তার সম্পদ, রক্ত এবং সম্মান রক্ষা করল। কখনই তা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। তবে ইসলামের কোন হক্ক নষ্টের সাথে সম্পর্কিত হলে - সেটা ভিন্ন কথা। যেমনটি রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই'-এ কথার স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই'- এ কথা স্বীকার করলে তারা আমার থেকে তাদের জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া। তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে"।

তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

"আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি এদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নন"(সূরা আল গাশিয়াহ্ ৮৮ : ২১-২২) (মুসলিম-৩৫)।

মুসলমানদের জন্য কারো জান-মাল ও সম্মান নষ্ট করার বৈধতার জন্য রয়েছে কতগুলো শরয়ী নীতিমালা ও শর্তসমূহ। এগুলো জিহাদি দলের সদস্যদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

অনেক সময় ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট সংস্থা অথবা দলে যুক্ত হয়। এই সংস্থা বা দলের সাথে তার সম্পর্ক আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে হয়। এই সম্পর্ক আল্লাহ এবং মুসলিমদের জন্য। অনেক সময় দেখা যায় - এই আনুগত্য ও সম্পর্ক শুধুমাত্র এই একই দলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অন্যদের ক্ষেত্রে এই 'আনুগত্য প্রদর্শন' পাওয়া যায় না। এর মানে হচ্ছে যে, তারা অন্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুপক্ষ ভাবে। এটি

মুসলিম এবং ইসলামের জন্য একটি ভয়াবহ মসিবত। মুসলিম দলগুলোর উচিৎ হবে –

যে কেউ এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল ও বান্দা এবং এই কথার বিরোধিতা করে না - তাহলে মুসলিম দলগুলোর অবশ্যই কর্তব্য হবে তার সাথে বন্ধুত্ব করা এবং সাহায্য করা। যদি এই স্বীকারোক্তির পরও তার প্রাপ্য অধিকার না দেন এবং অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করেন - তাহলে এটি মুসলিম এবং ইসলামের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

আপনি যদি শুধুমাত্র আপনার গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য ও "ওয়ালা-বারা" এর বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখেন এবং আপনার বিরোধী পক্ষের প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহলে এটি হল বিপথগামীতা এবং ইসলামে এটি একটি নতুন উদ্ভাবন বা বিদআত। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছিলাম যে, দল গড়ে ওঠে দুটি বিষয়ের উপর: প্রথমটি হল, দলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় কোরআন এবং সুন্নাহর নীতির উপর। আর দ্বিতীয়টি হল, সকল মুসলিমের প্রতি সু-সম্পর্ক ও আনুগত্য থাকা। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চিন্তাধারা সিরিজ

৩২

জয়-পরাজয়ের নামই হলো যুদ্ধ

শায়খ কাসিম আর-রিমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩২

জয়-পরাজয়ের নামই হলো যুদ্ধ

শাইখ কাসিম আর রিমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



যুদ্ধে জয়-পরাজয় অবধারিত। কখনো আপনার বিজয় হবে, আবার কখনো শত্রুপক্ষ আপনার উপর বিজয়ী হবে। এটিই যুদ্ধের চিরন্তন নিয়ম। এখানে একদিন বিজয় আপনার তো আরেকদিন প্রতিপক্ষের।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'অর্থঃ আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি"। (সূরা আল ইমরান ৩:১৪০)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"অর্থঃ ভালোকে মন্দ থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত, আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছো"। (সূরা আল ইমরান ৩:১৭৯)

আল্লাহ তায়ালা ভালোকে (সত্যিকার মুমিন) মন্দের (মুনাফিকের) থেকে আলাদা করেন। এমনটি কার সাথে ঘটেছে?

স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঘটেছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও আল্লাহ তায়ালা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করেছেন। বলুন তো, ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করা যাবে কীভাবে?

আমি কি এই পার্থক্যের বিষয়টা বুঝতে পারবো?

হ্যাঁ। অবশ্যই এটা জানা যাবে পরাজয়ের সময় বা বিপদের সময়। আপনি পরাজয়কে মন্দ ভাবছেন। অথচ তা মন্দ নয়। আল্লাহ তায়ালা এই বিপদ দূর করে দিবেন।

তখন আল্লাহ বলবেন: দেখো আমার বান্দা!

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

“অর্থঃ ভালোকে মন্দ থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত, আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছো”। (সূরা আল ইমরান ৩:১৭৯)

এই আয়াতের বাস্তব নমুনা আপনার সামনে স্পষ্ট। আর এটিই হলো পরাজয়ের অন্যতম উপকার। হ্যাঁ, মুসলিমরা পরাজয় বরণ করবে। কিন্তু মুসলিমের এই পরাজয় বাহ্যত পরাজয় হলেও বাস্তবে তা আত্মিক পরাজয় নয়।

যখন আত্মিক পরাজয় ঘটে তখন বাহ্যত আপনি যদি পিছু না হটে সামনে এগিয়েও যান এবং কোন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, তারপরও আপনি পরাজিত। কেননা এর অবধারিত ফলাফল হলো - আপনি সর্বদা শত্রুপক্ষের চাহিদাগুলো কার্যকর করবেন অর্থাৎ আপনি মূলত পুতুল সরকার হিসেবে থাকবেন। আর এটাই মূলত পরাজয়।

আমরা তো মুসলমান। আমাদের জন্য আত্মিক পরাজয় কখনো সমীচীন নয়। যুদ্ধের ময়দানে কখনো আমাদের সাময়িক পরাজয় হতে পারে। শত্রুপক্ষ চূড়ান্তভাবে আমাদের নিশানা মুছে ফেলতে চাইবে। তারপরেও আমরা জামাতবদ্ধ থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকবো। সুতরাং সাময়িক পরাজয় আল্লাহ চাহেন তো - পরাজয় নয়। বরং আত্মিক পরাজয়ই হলো আসল পরাজয়। ইনশাল্লাহ আমরা বিজয়ী।

যেমন, আসহাবুল উখদুদ। তাদের কথাই চিন্তা করুন। তারা কি করেছিল?

তারা তো এতটুকু করেছে যে, নিজেদের ঈমান রক্ষায় আগুনে ঝাপ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তারা আত্মিক পরাজয় মেনে নেয়নি। কি বলেন, ঠিক বলেছি কিনা?

উদাহরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনা আল্লাহ তায়ালা লিখে দিয়েছেন। আজ আমরা তাদের জীবনী অধ্যয়ন করছি, যাতে আমরাও তাদের মত হতে পারি। এ বিষয়টি ছাড়া কেউ দ্বীনের খেদমত করতে পারবে না। অর্থাৎ এই

পরিমাণ দৃঢ়তা লাগবেই। তাই আমরা অবিচলতার মাধ্যমে আমাদের দ্বীনের খেদমত করবো ইনশা আল্লাহ।

আমাদের সবাইকে যুদ্ধের বাস্তবতা বুঝতে হবে। আমি শুধু থিউরি শুনাচ্ছি না, বরং আমি আমার সঙ্গীদের সাথে কাজ করে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাদের বলছি। তাই আমাদেরকে যুদ্ধের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝতে হবে।

শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এটা-ওটা করবে, অনেক কিছুই করবে। শত্রুরাও এটা জানে যে, জয় পরাজয় নিয়েই যুদ্ধ চলতে থাকে। রাসূলের যুগেও যুদ্ধের নীতি এমনই ছিলো। কোন যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল বিজয় লাভ করলেন, তো অন্য কোন যুদ্ধে শত্রুরা বিজয় লাভ করতো (যেমন, বদরে বিজয়ী আর উহুদে সাময়িক পরাজয়)।

আল্লাহর রাসুল দৈনন্দিন জীবন ও পানাহারের ক্ষেত্রেও সব সময় এক রকম ছিলেন না। তিনি একদিন খেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন তো অপর দিন ক্ষুধার্ত থাকতেন।

****

চিন্তাধারা সিরিজ

নিরাপত্তার উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা জরুরী!

৩৩

শাইখ ইবরাহীম আবুল হাসান হাফিযাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩৩

নিরাপত্তার উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা জরুরী!

শাইখ ইবরাহীম আবুল হাসান (হাফিযাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও প্রকাশনা



بسم الله الرحمن الرحيم

নিরাপত্তার উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা জরুরী!

শাইখ ইবরাহীম আবুল হাসান (হাফিযাহুল্লাহ)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ

"অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, শত্রুর মোকাবেলায় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থির থাক!"। (সূরা আলে ইমরান ৩:২০০)

হাদিসে এসেছে,

إنما النصر صبر ساعة

'কিছু সময় ধৈর্যের মধ্য দিয়ে বিজয় আসে'।

যদি জিহাদের ময়দানে বিরক্তি চলে আসে তাহলে নিজেকে বল,'ওহে বীর সেনানী! প্রতিদিন জিহাদের অপেক্ষায় বসে থাকা এবং আমীরের নির্দেশে গাড়ি নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়া, এ সবকিছুতেই রয়েছে সওয়াব'। এ ধরণের কাজ করে কী-ই বা সওয়াব হবে - এমন চিন্তা মাথা থেকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলুন!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى

"অর্থ: সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকে যা নিয়ত করবে সে তাই পাবে"। (সহিহ বুখারি-০১)

তাই একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এসব শত্রুদের অনিষ্টতা থেকে নিজেকে এবং নিজ ভাইদেরকে রক্ষা করার মতো মহান আমলের মাধ্যমে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে।

আমাদের তো জানা আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবকুলের সবচেয়ে মহান ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেভাবে তাঁর রাসুলকে বায়তুল মাকদিস থেকে সাত আসমানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনিভাবে মক্কা থেকে মদিনায় কোন কষ্ট-ক্লেশ ও ঝুঁকি ছাড়াই নিয়ে যেতে পারতেন। তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের আদর্শ। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"অর্থ: যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের (সফলতার) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে"। (সূরা আহযাব ৩৩:২১)

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে। হিজরতের ক্ষেত্রে রাসুলের সুন্নাহ কী ছিল, তা আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকালে পূর্ণ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমাদের কর্তব্য হল; এসব উপকরণ গ্রহণ করা। আল্লাহ তাঁকে সমস্ত মানুষ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ চাইলে তো তাঁকে সুরক্ষিত অবস্থায় কাফেরদের সামনে দিয়ে সরাসরি বের করে আনতে পারতেন। যেমন সাইয়িদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন, তখন তিনি খোলা তরবারি নিয়ে প্রকাশ্যে বের হয়েছেন। অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় গোপনে বের হননি। মক্কা ত্যাগ করার সময় বলেছেন: 'যে তার মায়ের বুক খালি করতে চায়, সে যেন আমার পিছু নেয়'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। কী বলেন, ঠিক কিনা?

তাই তিনিও খোলা তরবারি নিয়ে প্রকাশ্যে বের হতে পারতেন, আর বলতে পারতেন, 'যে ব্যক্তি তার মায়ের বুক খালি করতে চায়, সে যেন আমার পিছু নেয়'।

আল্লাহর শপথ! তাঁর এ হুমকির সামনে টিকে থাকার মত আস্পর্ধা কারো থাকতো না। শুধু তাই নয়, বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতের সূচনাকালে দুর্বল অবস্থায় কাবার চারদিকে তাওয়াফ করছিলেন, আর সেই দুর্বল পরিস্থিতিতেও যখন কুরাইশরা ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন কটুকথা বলেছিল তখন তিনি বলেছেন,'আমি তোমাদেরকে যবেহ করতে এসেছি'।

তখন উপস্থিত প্রত্যেকেই এমনভাবে মাথা ঝুঁকিয়েছে যে, কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে মাথা উঠাতে পারেনি। অথচ ঐ মুহূর্তে তাঁর সাথে কোন কিছুই ছিল না। না ছিল কোন অস্ত্র, না ছিল অন্য কোন হাতিয়ার।

তারপরও কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে কাফেরদের হাতে বন্দি হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। মোটকথা আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধার করেছেন, যখন তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় আত্মগোপন করা অবস্থায় কাফেররা গুহার নিকটে পৌঁছার পরও আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন।

এখানে আমরা গোপনীয়তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

কীভাবে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা হবে। সর্বাবস্থায় গোপনীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গুহায় ছিলেন তখন কাফেররা গুহার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ নিজ পায়ের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে'। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর উপর ভরসা করে বললেন, 'তুমি ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন!'। বিষয়টি কুরআনে এভাবে এসেছে -

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ

تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ ৯:৪০)

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন। ফলে তারা রাসুলকে দেখতে পায়নি। কারণ তিনি সবধরনের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন।

পরবর্তীতে সুরাকা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দিষ্ট একটি অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সম্পর্কে অবগত হল, তখন সে তার পিছু নিল। কিন্তু কেন?

মহা পুরষ্কার হিসেবে একশত উট গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু সুরাকা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীকে স্বচক্ষে দেখামাত্রই আল্লাহ তাকে অক্ষম করে দিলেন। তাই সে কোন কিছুই করতে পারেনি। তাই যদি আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করি ও আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী উপকরণ গ্রহণ করি, তাহলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, শত্রু আমাদেরকে দু'চোখে দেখবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। বরং আল্লাহ তাকে অক্ষম ও অসহায় করে দিবেন।

এ ধরণের ঘটনা আমাদের অনেক ভাইদের সাথে বহুবার ঘটেছে। যেমন তারা শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে ভুলবশত অন্য কোন একটা বাহিনীতে ঢুকে পড়ে। সুবহানাল্লাহ! এই কঠিন ও দুরূহ মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য একজনকে অনুগত করে দিয়েছেন। তখন লোকটি তাকে বলছে; 'যাও, যাও। হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যাও।' সম্ভবত শত্রু আপনাকে দেখছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তখন শত্রু বাহিনীর এমন কাউকে বশীভূত করে দেন, যে ব্যক্তি তাদের হাত থেকে

আপনার মুক্তির মাধ্যম হবে। কিংবা শত্রু আপনাকে দেখে কিন্তু আল্লাহ তাকে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত করে ফেলেন। ফলে আপনি শত্রুর সামনে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যেতে পারবেন।

তো ভাইয়েরা আমার!

এধরণের ঘটনা নানা পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাস্তায় অনেক ভাইয়ের সাথে ঘটেছে। সুতরাং নিরাপত্তার উপায় বা মাধ্যম সমূহ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। যেমনিভাবে পূর্বে বলেছিলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলা তরবারি হাতে মক্কা থেকে মদিনায় বের হয়ে যেতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা রাসুলকে সবার সামনে দিয়ে মক্কা হতে মদিনায় নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এ অবস্থায় সবার সামনে দিয়ে বের না হওয়া ছিল উম্মতের জন্য শিক্ষা ও আদর্শ। কারণ সবাই তো আর ওমরের মত খোলা তরবারি হাতে বের হতে পারবেনা।

তাই নিরাপত্তার উপকরণ গ্রহণ করা খুবই জরুরী। তবে তা হতে হবে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে। শুধু উপায়-উপকরণের উপর মিথ্যা ভরসা করা যাবে না। আল্লাহর উপর ভরসার ভানও ধরা যাবে না।

****

চিন্তাধারা সিরিজ

মিল্লাতে ইবরাহীম ও তার অকাট্য বিষয়গুলোর প্রতি শিথিলতা

৩৪

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরী রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩৪

মিল্লাতে ইবরাহীম ও তার অকাট্য বিষয়গুলোর প্রতি শিথিলতা

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

سلسلة مفاهيم، الحلقة 34:"ملة إبراهيم وتمييع الثوابت" للشيخ سعيد الشهري (رحمه الله)

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ০০:০৩:৯০ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: শাবান, ১৪৪৩ হিজরি

প্রকাশক: আল-মালাহিম মিডিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

মিল্লাতে ইবরাহীম ও তার অকাট্য বিষয়গুলোর প্রতি শিথিলতা

শাইখ সাঈদ আশ-শিহরী রহিমাহুল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন মক্কায় মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতেন, তখন সর্বপ্রথম নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করেন। কারণ তাঁর মাধ্যমেই মক্কার সমাজে দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা হয়। তারপর তা বিতর্কের দিকে মোড় নেয়। ফলশ্রুতিতে মক্কার রাজনীতিতেও নানাবিধ বিতর্ক শুরু হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় মক্কা নগরীতে মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক আনীত নতুন দ্বীন নিয়ে তাঁর সাথে মক্কাবাসীদের বিতর্ক শুরু হয়। তিনি ঘোষণা করলেন: 'আমি মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর আছি'। তখন তারা বলল: 'না, বরং আমরাই মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর আছি'।

এখানে বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল – কে প্রকৃত অর্থে মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর আছে? কে সেই প্রকৃত তাওহীদের উপর আছে; যে তাওহীদের অনুসরণ স্বয়ং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করতেন।

প্রত্যেকের দাবি ছিল - সে মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর আছে। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতির দাবি ছিল এই যে, প্রত্যেককে তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতে তারা বলল, 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনার দাবির স্বপক্ষে দলীল আমাদের সামনে পেশ করুন'।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় ও অবস্থা বর্ণনা করার জন্য সূরা মারইয়ামে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন -

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

অর্থঃ “আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী”। (সূরা মারইয়াম ১৯:৪১)

এই আয়াতের মাঝে উল্লেখিত ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল - ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিচয় তুলে ধরা। পবিত্র কুরআনে তাঁর পরিচয় এভাবে এসেছে-

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

অর্থঃ “নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী”। (সূরা মারইয়াম ১৯:৪১)

তিনি কে? তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতি কেমন ছিল? তিনি কীভাবে দাওয়াত দিয়েছেন? তাঁর দাওয়াত কি সমাজ থেকে দূরে কোথাও ছিল? নাকি তাঁর কওম তথা গোত্রের মাঝেই ছিল? তিনি কি তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকেই প্রথমে দাওয়াত দিয়েছিলেন? - এসবের উত্তর কুরআনে এভাবে এসেছে -

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا

অর্থঃ “যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেনঃ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন করেন?” (সূরা মারইয়াম ১৯:৪২)

এখন আমরা কি কতিপয় মুশরিক ও প্রবৃত্তিপূজারীদের দাবির প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত কুরআনের এসকল আয়াত বাদ দিয়ে দিব? অথচ এই আয়াতগুলোতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে।

তারা আপনাকে বলবে- ‘হে ভাই, আমরা এমন কিছুর ইবাদত করি না; যা শুনতে পায় না। যদিও আমাদের বিশ্বাস এগুলো দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, তবুও আমরা এসবের ইবাদত করে যাচ্ছি’। এরপর আপনি যখন তাদের বলবেন, ‘হে ভাই! যে জিনিস শুনতে পায় না, দেখতে পায় না, সেসবের ইবাদত কেন কর?’ তখন তারা প্রত্যুত্তরে আপনাকে বলবে- আমরা এই বিষয়টির স্বপক্ষে “আরবী ভাষা থেকে” প্রমাণ পেয়েছি। অথবা তারা বলবে “আমাদের প্রবাদ-প্রবচন এমনটা বলেছে”। অথবা বলবে “তাদের শোনার একটা সম্ভাবনা রয়েছে”। অথবা

বলবে "অমুকে বলেছে"। অথবা বলবে "এটি একটি প্রচলিত বিষয়" আর তাই আমরা সেগুলোর অনুসরণ করে যাচ্ছি।

এই ভাবে তারা দ্বীনের সকল মৌলিক বিষয় পরিবর্তন করে, শরীয়তের মাসআলার মাঝে বিভিন্ন মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। এক সময় পুরো দ্বীনকেই বিতর্কের বস্তু বানিয়ে ফেলেছে। কারণ, দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের নিকট কোন সুদৃঢ় নীতিমালা ছিল না। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ববাদের ক্ষেত্রেও তাদের কাছে কোন সুদৃঢ় মূলনীতি ছিল না।

ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং তাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তারা বলে- "এটির নাম হচ্ছে সাহায্য-সহায়তা"। আমরা একে অপরকে সাহায্য করছি মাত্র। কারণ "এটি আমাদের মৈত্রীচুক্তির একটি অন্যতম শর্ত" এবং "সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এটি তাদের প্রাপ্য অধিকার"।

এখন আমরা আলোচনা করবো - কেন তাদের মাঝে শরীয়তের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর উত্তর এতটাই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যার মাঝে আর কোন মুজতাহিদের জন্য ইজতেহাদ করার কোন সুযোগ রাখেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

অর্থঃ "যখন ইবরাহীম বললেনঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন"। (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৫)

আপনি নীচের আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। নিজস্ব কোন যুক্তি পেশ করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের"। (সূরা মায়েদা ৫:৪৪)

আপনি কীভাবে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, ‘না, না, আয়াতের উদ্দেশ্য এখানে এটা না। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে- “আমাদেরকে এটা বিশ্বাস করতে হবে” আর “ওটা বিশ্বাস করা যাবে না” অথবা “আমাদেরকে এটাই বিশ্বাস করতে হবে” ...। অথচ আপনার এই বক্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কোন দলীল নাযিল করেন নি।

বিশেষ করে আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনার কোন যুক্তি চলবে না। কেননা, আকিদা-বিশ্বাসকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বান্দাদের জন্য এমনভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেখানে কারো পক্ষ থেকে অনুমান করে কিছু বলার সুযোগ নেই। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই আকিদা-বিশ্বাসকে সকলের বোধগম্য করেছেন, যা সহজেই সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। যদি যুক্তি পেশ করে আকিদাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হতো, তবে আমাদের সবাইকে জাহান্নামে যেতে হতো।

আকিদার মৌলিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণিত। আর তাই কুরআনে বর্ণিত শরীয়তের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসগুলো সকল মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। একটি উদাহরণ দেখুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ “হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না”। (সূরা মায়েদা ৫:৫১)

সাধারণ মানুষও সহজে এই আয়াতের বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। কারো পক্ষে এই সুযোগ নেই যে, সে এই আয়াতের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে বলবে- এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয়, যেমনটি বলা হয়ে থাকে। বরং এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের প্রতি অবশ্যই ভালোবাসা থাকতে হবে!! শুধু তাই নয় বরং

ভালবাসার সাথে সাথে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাও করতে হবে! আর সাহায্য-সহযোগিতার পাশাপাশি আরও অনেক কিছু করতে হবে...!!!

এটি একটি কঠিন বিষয়ই বটে! এর কারণে মানুষ সমস্যায় পড়ছে। কি ধরণের সমস্যায় পড়ছে?

তাদের এসকল ভ্রান্ত ব্যাখ্যা মোতাবেক দখলদার শত্রুকে আমাদের ভূমিতে অধিকার দিতে হবে! এমনিভাবে তাদেরকে আমাদের সাথে বসবাস করার অধিকার দিতে হবে! আর এসবগুলোই আমাদের জন্য বিরাট সমস্যার কারণ বলে বিবেচিত।

এখন আমরা এসব মৌলিক বিষয় অর্থাৎ মিল্লাতে ইবরাহীম নিয়ে শরয়ী পর্যালোচনা পেশ করবো। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্তি সবেমাত্রই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন-'হে ইবরাহীমের অনুসারীরা! এই সময়ে তোমরা যেই ধর্ম অনুসরণ করছো, তাতে শিরক রয়েছে। তাই তোমরা শিরক ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদাত করো'।

মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগে এই জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা নতুন করে বিতর্ক শুরু করে বলে, 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আমরা কি মিল্লাতে ইবরাহীমের উপরে নেই? আমরা কি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী নই? অথচ আমরা ইবরাহীমের এই মক্কাকে এখন পর্যন্ত সযত্নে আগলে রেখেছি। আমরা হজ্জের বন্দোবস্ত করি। আর আমরাই তো বর্তমানে বিজয়ী'।

তখন পুরো জাযিরাতুল আরবে ধর্মীয় রাজনীতির নেতৃত্ব দিত কুরাইশ বংশ। তাই তারা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো দ্বীনের মাঝে এমন কিছু বিষয়ের প্রবর্তন করে, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করেননি। কুরাইশরা তাদের অর্থনৈতিক ও উপজাতিবাদ চিন্তাধারা থেকে দ্বীনের মাঝে তথা মিল্লাতে ইবরাহীমের মাঝে বিকৃতি সাধন শুরু করে। একটি উদাহরণ দেখুন -

তখনকার মক্কা পুরো জাযিরাতুল আরব শাসন করতো ও নিয়ন্ত্রণ করতো। সে সময়ে পুরো জাযিরাতুল আরব মক্কার অধীন ছিল। প্রতি বছর হাজীরা হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে দূর-দূরান্ত থেকে মক্কায় আসতো। এই হজ্জের সাথে কুরাইশীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিলো। মানুষ যখন মক্কায় আসতো তখন কুরাইশীরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কুরাইশীরা হাজীদের থেকে অর্থ নিতো,

আর বনু হাশেম অর্থগুলো নিজেদের মাঝে বণ্টন করতো; বনু আবদে মানাফ ও অন্যান্য গোত্রের মাঝে।

তারা মক্কার নেতৃত্ব নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেয়। তাদের কারো ভাগে ছিলো হাজীদের বাহনের লাগাম ধরার দায়িত্ব। কারো ভাগে ছিলো তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব। এর বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট অংকের অর্থ নিতো। এতে তাদের অর্থনীতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

তখনকার মক্কায় না ছিল কোন কারখানা, আর না ছিলো কোন চাষের ভূমি। অর্থাৎ হজ্জ ছাড়া তাদের আয়ের অন্য কোন উৎস ছিলনা। তাই হজ্জকে তারা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। সে জন্য তারা হজ্জের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিত।

এই ব্যবসায়িক লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা হলো- 'কোন মানুষ বাহির থেকে মক্কায় আসলে, তাদের জন্য বাহির থেকে এহরামের কাপড় কিনে নিয়ে আসা নিষেধ। বরং এহরামের কাপড় মক্কা থেকেই কিনতে হবে'।

আর আমরা বাহির থেকে কাপড় কিনে এনে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করবো। এভাবে তাদের ধর্মীয় কাজগুলো ব্যবসায়ে রূপ নেয় এবং তারা হজ্জকে কেন্দ্র করে নতুন করে ব্যবসা শুরু করে।

তাদের ব্যবসায়িক মুনাফা প্রতি বছর বাড়তে থাকে। তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হতে থাকে। ঠিক আছে, তবে কিছু মানুষ এমন ছিলো, যাদের কাছে কোন কাপড় ছিলো না। ফলে তারা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো।

অন্যদিকে তারা স্থির করে যে, আমরা যদি বাহির থেকে কাপড় কিনে আনতে না পারি, তাহলে আমরা কাবার দরজা খুলব না। কারণ এতে আমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার আশংকা রয়েছে।

এই জটিলতা এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। একারণে বর্তমানেও বাইতুল্লাহতে হজ্জ করতে হলে অবশ্যই সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদনকৃত কোন না কোন হজ্জ কাফেলার সাথে যুক্ত হতে হয়। অমুক কাফেলা, তমুক কাফেলা...। এ লক্ষ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন পূরণ করতে প্রতিটি রাষ্ট্রকে তিনশ থেকে দুই হাজার পাঁচশত

ডলার পর্যন্ত দিতে হয়। তাছাড়া এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রচারাভিযানও থাকতে হবে। এমনটা কেন?

কারণ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে বাহির রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ আমদানি করতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ মজুদ থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রতি বছর মক্কায় তিন থেকে পাঁচ মিলিয়ন তথা ৩০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ হাজী হজ্জ করতে আসে। প্রত্যেককে গড়ে সর্বনিম্ন দুই হাজার ডলার থেকে শুরু করে উপড়ের দিকে নয় হাজার ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে হয়। মোটকথা, প্রতি বছর এই ধরনের একটি বিশাল বাজেট বাইরের রাষ্ট্র থেকে আসে। আর এটি সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এক বিরাট মুসিবত। তো এই মুসিবত কোথা আসলো? কীভাবে আসলো?

এই মুসিবত এসেছে, সেই আইনের কারণে, যা তারা দারুন নাদওয়াতে তৈরি করেছিল। বনু হাশেম, বনু আব্দুদদার এর সাথে বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বলেছে - পুরো জাযিরাতুল আরবকে সরাসরি তাদের আনুগত্য করতে হবে। এটা কেন? কারণ তারা এখন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এই রাজনীতির নাম ছিল - ধর্মীয় রাজনীতি।

আর এই ধর্মীয় রাজনীতি কুরাইশ ছাড়া অন্য কোন গোত্রের সাথে মানায় না! কারণ তারা 'আহলে বাইত' তথা 'বাইতুল্লাহর অধিবাসী'। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

সেসময় সমগ্র আরব সমাজে তাদের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান ছিলো। তাই কারো পক্ষে তাদের উপর কিংবা তাদের বিভিন্ন কাফেলার উপর সীমালঙ্ঘন করার সাহস ছিলো না।

আরবের প্রতিটি গোত্র বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দিনকাল অতিক্রম করতো। কিন্তু কুরাইশরা কোন বিপদেরও সম্মুখীন হতো না। কেউ তাদের পিছু নিতো না। এটা কি কারণে?

এর একমাত্র কারণ ছিল 'মক্কা'। কুরাইশদের কাফেলা ব্যতীত অন্য কোন কাফেলা নিরাপদে তাদের মালামাল নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। কারণ ছিল - কুরাইশরা

ধর্মীয় রাজনীতি করতো। আর ধর্মীয় রাজনীতি তাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এভাবেই এই অঞ্চলে তাদের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

*****

চিন্তাধারা সিরিজ

পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত অপারেশন

৩৫

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩৫

‘পরিকল্পিত’ ও ‘অপরিকল্পিত’ অপারেশন

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

سلسلة مفاهيم، الحلقة 35:"العمليات الاختيارية والعمليات الاضطرارية"

للشيخ قاسم الريمي (رحمه الله)

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ০০:০৩:১৪ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: শাওয়াল, ১৪৪৩ হিজরি

প্রকাশক: আল-মালাহিম মিডিয়া

‘পরিকল্পিত’ ও ‘অপরিকল্পিত’ অপারেশন

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

অপারেশনগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। কিছু ঐচ্ছিক ও পরিকল্পিত এবং কিছু অনৈচ্ছিক বা অপরিকল্পিত। আপনার কোন অপারেশনই এই দুই অবস্থার বাইরে নয়। আপনি হয় স্বাধীন এবং স্বেচ্ছায় অপারেশন করছেন। অথবা আপনি অপারগ, অনন্যোপায় হয়ে অপারেশন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই আপনার যে অপারেশন পরিকল্পিত সেক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং খুব সজাগ থাকতে হবে।

আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে, কোনটা ঐচ্ছিক বা পরিকল্পিত অপারেশন? আর কোনটা অপারগ বা অনন্যোপায় অবস্থার অপারেশন?

ঐচ্ছিক বা পরিকল্পিত অপারেশনের ধরণটা এমন – মনে করুন আপনি ঠিক করছেন একটি অপারেশন পরিচালনা করবেন। এ অবস্থায় উচিত হচ্ছে পরিকল্পনা করা। কীভাবে, কখন, কোন দিক থেকে, কী দিয়ে - অপারেশনটা করবেন সেটার পরিকল্পনা করতে হবে। কোন পদক্ষেপ নিরাপদ আর কোনটা ঝুঁকিপূর্ণ – সেটাও নির্ধারণ করতে হবে। কোন পদ্ধতি কার্যকর হয় আর কোনটা ব্যর্থ হয় - সেটাও খুঁজে বের করতে হবে। এভাবে অপারেশন করাকে বলে পরিকল্পিত বা ঐচ্ছিক অপারেশন।

পরিস্থিতি কখনও কখনও এমন হয়ে যায় যে, অমুক দিকে অপারেশন করা পরিকল্পনায় ছিল না কিন্তু এখন করতে হচ্ছে। এটাই হলো অপরিকল্পিত জরুরি অপারেশন। এই পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

পরিকল্পিত অপারেশনে আমি আমার মতো করে পরিকল্পনার সুযোগ পাই। সর্বদিক বিবেচনা করে উপযুক্ত স্থানটা বেছে নেই। তাই না?

অন্যদিকে অপরিকল্পিত অপারেশন তো অপারগ অবস্থায় আমরা বাধ্য হয়ে করছি। সুতরাং এই পরিস্থিতিটা কীভাবে মোকাবেলা করা যায়?

বিষয়টা বেশ জটিল। অপারগতা সেটাই, যেখানে আমি সীমালঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ি করবো না।

দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১- অনেক সময় অনেক ভাই দূরত্ব কমানোর জন্য সীমালঙ্ঘন করে থাকেন, আর বলেন আমি নিরুপায়।

২- কিছু কিছু গোষ্ঠী বা দল আপনাকে বলবে আমরা দ্রুত সংঘর্ষের অবসান করতে চাচ্ছি। এই বলে তারা সেখানে গিয়ে ত্রিশ-চল্লিশ টন ওজনের গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত করবে।

এগুলো অপারগতা নয়, বরং অপরাধ।

অনুমতি তো আমি শুধু ততটুকুই পাবো যতটুকুতে আমি অপারগ। সেটা আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়েও দিবে না।

কখনও কখনও তাগুত আপনাকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে। আপনি হয়তো 'শান্তিপূর্ণ রাজনীতি' অথবা 'জাতীয় নিরাপত্তার আইনের' বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এখন আপনার বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলার তদন্ত করতে লোকজন এসেছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে করা কোন একটি মামলার তদন্ত করছে। তো এ অবস্থায় আপনি কী করবেন?

কোনভাবে তাকে বুঝ দিয়ে ফিরে আসবেন, ব্যস। এটাই তো হওয়া উচিত, নাকি?

কিন্তু না, আমি অঘটন না ঘটিয়ে কোন কিছুতে হাল ছাড়ি না। তাই একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম!! চিন্তাধারাটি বুঝা যাচ্ছে?

এই ধরনের অপারগতা(?) আমাকে মূল কাজ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কখনও কখনও আমরা অপারেশন চালাতে বাধ্য হই। তদন্তের নামে তারা আমাদেরকে নির্যাতন করবে আর আমরা নীরব থাকবো - এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি আপনার সাথে এ বিষয়ে একমত, বিশেষ করে যদি এটি পূর্বে থেকেই আপনার প্ল্যানে থাকে। কিন্তু যদি আপনার প্ল্যানে পূর্ব থেকে এটা না থেকে থাকে, তাহলে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

কখনও ভুল অপারেশন হয়ে যায়। এটা হতেই পারে, কোনও সমস্যা নেই। তবে ভুলটা যেন তাদের পাতানো ফাঁদে পড়ে না হয়!! আপনি আপনার প্ল্যানে অটুট থাকুন। কারণ আপনাকে আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। হ্যাঁ, কিছু কিছু সময় এটা সম্ভব হবে না।

ওকে, পরিকল্পিত অপারেশন আপনার ইচ্ছা মতই চলবে। আর অনন্যোপায় অবস্থার অপরিকল্পিত অপারেশনে আপনার লক্ষ্য থাকবে - অপারেশন চালিয়ে দ্রুত সটকে পড়া। অনেক সময় একটা অপারেশন আপনাকে অন্য আরেকটা অপারেশন এর সাথে জড়িয়ে ফেলবে। আপনি চেষ্টা করবেন, যেকোনও উপায়ে যেন সেখান থেকে সটকে পড়া যায়।

****



চিন্তাধারা সিরিজ

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৩৭

শাইখ কাসিম আর-রীমি রহিমাহুল্লাহ







চিন্তাধারা সিরিজ- ৩৭

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

শাইখ কাসিম আর-রীমী রহিমাহুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের মনে রাখা উচিৎ তাগুত এবং আমাদের বিরোধী মুসলিম ভাই; উভয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পন্থা কখনোই এক হবে না। দুটি লড়াইয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিরোধী মুসলিম সে যেই হোক, হয় সে আপনার ভাই, আপনার গোত্রভুক্ত বা মুসলিম কোনো জামায়াতেরই সদস্য। তাই তার বিরুদ্ধে লড়াই কখনোই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো হবে না।

আল্লাহ পানাহ! আমরা মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে পারি না। ফাটল সৃষ্টির জন্য অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারি না।আমরা কখনোই আমাদের মুসলিম ভাইদের শাস্তি প্রদানের জন্য যুদ্ধ করতে পারি না। তাদের সাথে মিথ্যা প্রতারণার আচরণ করতে পারি না। আমি যদি কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, তাহলে সেখানে আমাকে 'ইসলামের নীতি' ও যুদ্ধের আদাব মেনেই যুদ্ধ করতে হবে।

কোনো মুসলিম জামায়াত, গোত্র বা যে কোনো মুসলিমের সঙ্গেই কিতাল হোক, আমি তার প্রতি মিথ্যারোপ করতে পারি না। তাদের মাঝে গুপ্তচর প্রেরণ করতে পারি না, যে তাদের ভেতরে প্রবেশ করে ওঁৎ পেতে বসবে। এটা হতে পারে না। এটা তো 'তাজাসসুস' তথা মুসলিমদের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান। মুসলিমদের উপর 'তাজাসসুস' করা যায় না। আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে!

যে কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। যেমন 'খুদআহ' বা ধোঁকা। তুমি যখন শত্রুর বিরদ্ধে যুদ্ধ করবে, তখন পিছু হটে শত্রুকে প্রতারিত করবে। সে খালি দেখে অগ্রসর হলে, তুমি তাকে হত্যা করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এভাবে তুমি শত্রুকে শাস্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে তুমি যখন কোনো মুসলিমকে বন্দী করবে, তখনও কি তার সঙ্গে সেই আচরণই করবে, যা কাফেরের সঙ্গে কর? তোমার এক মুসলিম ভাই, আহত অবস্থায় রণাঙ্গনে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গেও কি একই আচরণ করবে, যা কাফেরের সঙ্গে করো? না, কস্মিন কালেও না! বিষয়টি একদমই পরিষ্কার!

***